বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী

পুনর্জন্ম

রোকসানা নাজনীন

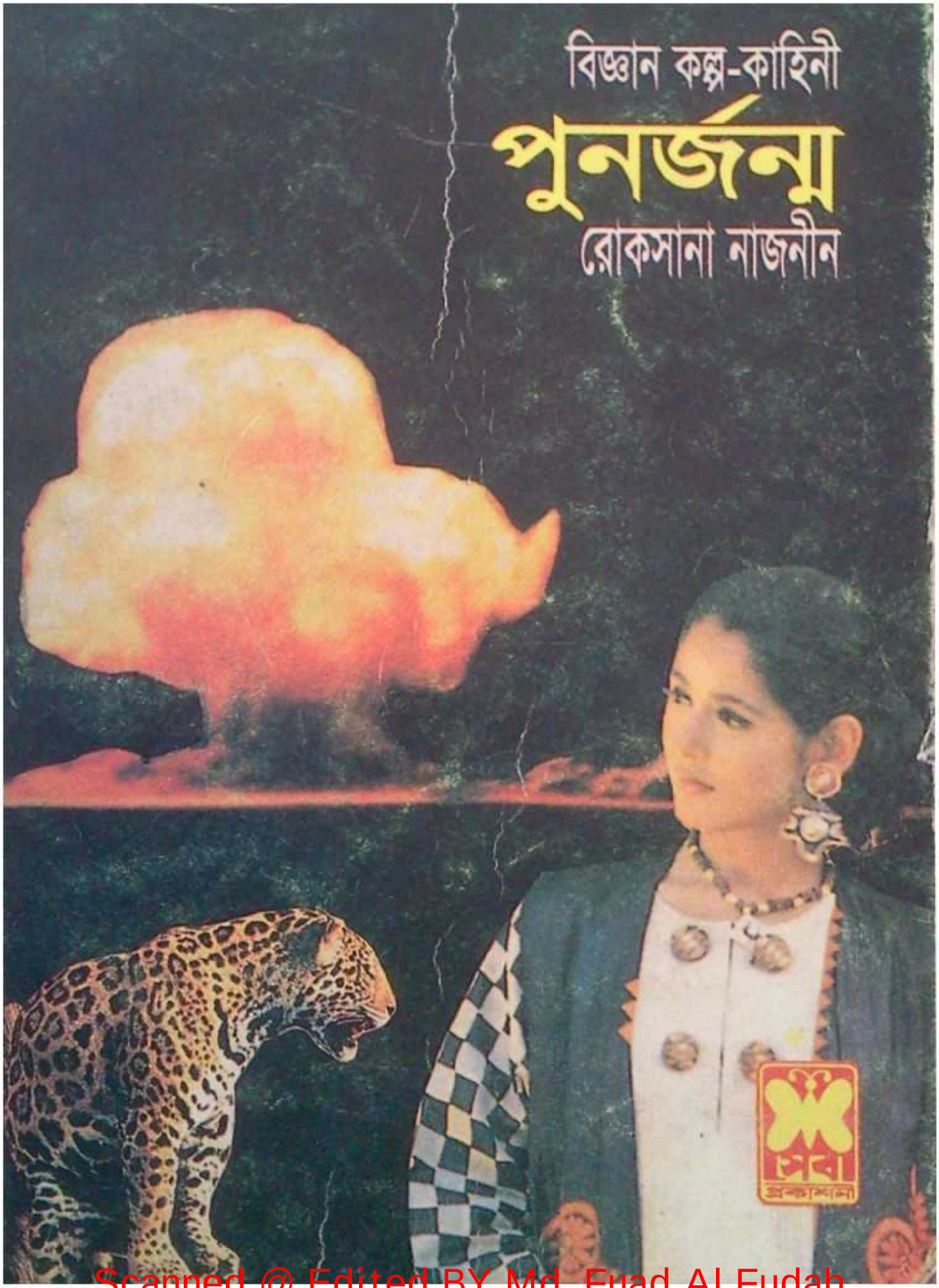

সেবা প্রকাশনী

Scanned @ Edited BY Md. Fuad Al Fudah

বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী

পুনর্জন্ম

রোকসানা নাজনীন

কে ও, যার কাছে চাইলেই সব পাওয়া যায়?
কেন একের পর এক অঘটন ঘটছে ঢাকার বুকে?
নিজে কি চায় ও? ওর ইচ্ছে কি শেষ পর্যন্ত পূরণ হলো?

সাবিনা বলল, তুমি কথা দিয়েছ আমাকে চিরদিন ভালবাসবে। জাভেদ সত্যি ভালবাসে ওকে। তবু জাভেদ সাবিনার কাছ থেকে পালাচ্ছে কেন উদভ্রান্তের মত?

পৃথিবীর মানুষ কি পাগল হয়ে গেল? রাস্তায় বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন হিংস্র পশুর দল? মানব সভ্যতা কি ধ্বংস হয়ে যাবে?

এমনি আরও দু'টি চমকপ্রদ বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী নিয়ে এই বই। প্রতিটি কাহিনীতে পাবেন আলাদা চমক। ভাববেন, এও কি সম্ভব!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

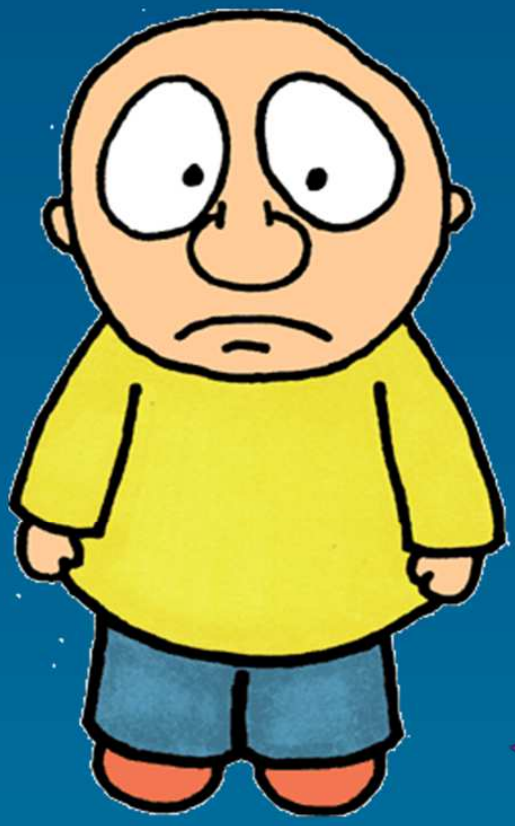

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সায়েন্স ফিকশন

পুনর্জন্ম

রোকসানা নাজনীন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-0216-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PUNORJANMO
Science Fiction Stories
By: Roksana Nazneen

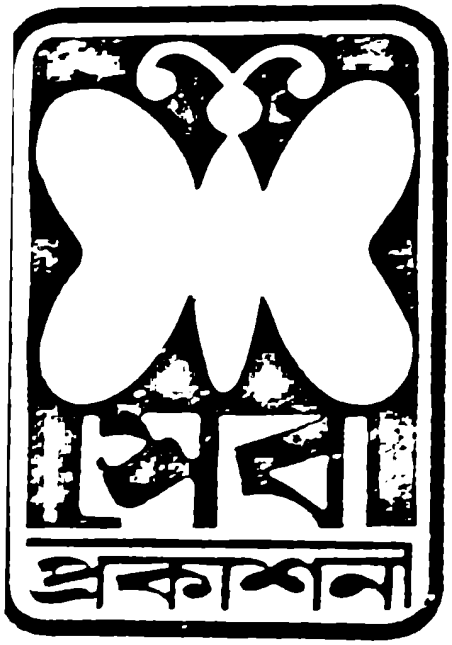

বত্রিশ টাকা

সূচি

স্বপ্না	৫
পুনর্জন্ম	৩৭
সুরলোক	৬৪
সাজা	১০১
ইরাম	১৩১

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন
বিশ্বাসঘাতক, আর্তনাদ, হলো না, রত্না, বন্দিনী, পাপে মৃত্যু, দাঁড়াও পথিক, রহস্যময়ী।
রকিব হাসান
মৃত্যুচুম্বন।
ইউসুফ ফারুক
দ্বীপ, বিভীষিকা।
নিয়াজ মোরশেদ
বন্দী শিবির ১ ও ২
কাজী সারওয়ার হোসেন
আড়াল।
তাহের শামসুদ্দীন
শিবসেনার মৃত্যুফাঁদ, মৃত্যুর কারিগর, মণিকার সুখ, স্বপ্ন যখন ভাঙলো, সম্রাজ্ঞীর মুকুট, মুম্বাই মাফিয়া, কাঁদছে দেবিকা।
ইফতেখার আমিন
ক্ষুরদাঁত, মরীচিকা।
খসরু চৌধুরী
দালানবাড়ি।
কাজী শাহনূর হোসেন
প্রফেসর মাসুদ রানা।
কাজী মায়মুর হোসেন
ওস্তাদের মার।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

স্বপ্না

এক

ইনোবোটিক্স লিমিটেডের মাঝারি সাইজের দোতলা বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ তুমুল উত্তেজনা। কর্মচারীরা ফিটফাট পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বয়-বেয়ারাদের নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। সবার মনোযোগ দোতলার কনফারেন্স রুমের বন্ধ দরজার দিকে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী আরও তিনজন সরকারী কর্মচারী নিয়ে ঠিক সময়মতই হাজির হয়েছেন, এ মুহূর্তে কনফারেন্স রুমে ইনোবোটিক্সের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় লিপ্ত।

কনফারেন্স রুমে সব মিলে জনা চল্লিশেক লোক। এরমধ্যে পনেরোজন এখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বাকি সবাই নিমন্ত্রিত অতিথি। বাণিজ্য মন্ত্রী ছাড়াও অন্য তিনটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এসেছেন, আর আছেন তিনজন সাংবাদিক। ইনোবোটিক্সের মালিক নাসির ওয়াজেদ ধীর পায়ে দেয়ালজোড়া স্ক্রীনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

লম্বা-ফর্সা নাসির ওয়াজেদ যথেষ্ট সুপুরুষ, বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনোবোটিক্স লিমিটেড এদেশের গর্ব, প্রথমদিকে ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র উৎপাদন দিয়ে শুরু করলেও হালে প্রচুর নাম কিনেছে রোবোটিক্সের গবেষণায়। একজন সফল শিল্পপতি হিসেবেই নাসির ওয়াজেদের পরিচিতি। অনেকেই জানে না তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞানী।

খুক খুক করে গলা পরিষ্কার করলেন নাসির ওয়াজেদ, 'কষ্ট করে সবাই এসেছেন, সেজন্যে আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণ, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। 'আমাদের এই প্রতিষ্ঠান নতুন একটা

আবিষ্কার বাজারজাত করতে যাচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন যে ডেমনস্ট্রেশনের জন্যে আপনাদেরকে আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি এখানে। মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কয়েক দফা আলাপ আগেই হয়ে গিয়েছে, তাঁর পরামর্শেই আজকের এই ডেমনস্ট্রেশনের আয়োজন করেছি।' মোটা চশমার আড়ালে চোখ বুজে আছেন মন্ত্রী, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। বিরাট লম্বা টেবিলের দু'ধারে ল্যাইন ধরে বসা অতিথিদের একবার দেখে নিলেন নাসির ওয়াজেদ, তারপর রিমোট কন্ট্রোলের বাটনে মৃদু চাপ দিলেন। পিছনের স্ক্রীনে ভেসে উঠল কিছু পরিসংখ্যান আর পাই-চার্ট। 'এদেশের শতকরা তেষট্টি ভাগ পরিবারেই বাবা-মা দু'জনেই কর্মজীবী। এদের প্রায় সবাইকেই ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্যে কাজের লোকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই যে দেখুন,' লম্বা ছড়ি দিয়ে পাই-চার্টের কেন্দ্রে খোঁচা দিলেন তিনি, 'পরিবারের আয়ের এক সিংহ ভাগই খরচ হয়ে যাচ্ছে শুধু এই একটি খাতে।'

'ইনোবোটিক্স কি এবার ডে-কেয়ার ব্যবসায়ে নামবে নাকি?' ঠোঁটকাটা এক সাংবাদিক ফোড়ন কাটল।

রাগলেন না নাসির ওয়াজেদ, মৃদু হাসলেন, 'না, ডে-কেয়ার নয়। বরং হোম-কেয়ার বলতে পারেন। এই যে, দেখুন।' হাতের ইশারা করতেই একজন উঠে গিয়ে কোণের ছোট্ট দরজাটা খুলে দিল। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ধীরপায়ে ঘরে ঢুকল সুন্দরী এক তরুণী। উজ্জ্বল শ্যামলা, সুশ্রী। হলুদ রঙের তাঁতের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা ঝরঝরে কালো চুল, সতেজ মসৃণ ত্বক। দীর্ঘ পল্লবঘেরা বড় বড় কালো দুই চোখ, অথচ সেই চোখ কেমন যেন প্রাণহীন। অদ্ভুত একটা বিষণ্নতা ছড়িয়ে আছে, মেয়েটির সারা অবয়বে। 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ হলো স্বপ্না,' মেয়েটির কাঁধে হাত রাখলেন নাসির ওয়াজেদ, চোখে বিজয়ীর উল্লাস।

এদিকে ঘরজুড়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছে, উত্তেজনায় কয়েকজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক রাশিদ করিম টেবিল চাপড়ে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, তারপর বিস্ময়াহতকণ্ঠে

বললেন, 'এ তো আপনার সেই আগের রোবটটার মতই আর একটা রোবট!'

'করিম সাহেব, ভুল করছেন,' মৃদু হাসলেন নাসির ওয়াজেদ, 'ওটা ছিল সাথী। স্বপ্না সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এর কাজ হলো ছোট বাচ্চা-কাচ্চাদের দেখাশুনা করা, এ বিষয়ে স্বপ্না একজন এক্সপার্ট। ফার্স্ট-এইড থেকে চাইল্ড সাইকোলজী সবই ওর নখদর্পণে। চিন্তা করে দেখুন এমন একজন সঙ্গী শিশুদের মানসিক গঠনে কি দারুণ ভূমিকা নিতে পারে। তাছাড়া সাধারণ কাজের লোকের যে সমস্ত দোষ থাকে, তার কিছুই এর নেই। বাবা-মারা এর উপরে পুরোপুরি নির্ভর করতে পারবে। ও, আর একটা কথা, স্বপ্না বাচ্চাদের দেখাশোনা ছাড়াও ঘরের অন্যান্য সব কাজই করতে পারে। বলতে পারেন এ হলো সব গৃহবধূর স্বপ্ন। সেজন্যেই ওর নাম রেখেছি স্বপ্না।'

দমলেন না রশিদ করিম, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'এবারে আপনি তাহলে শিশুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাচ্ছেন!'

গম্ভীর হয়ে গেলেন নাসির ওয়াজেদ। 'স্বপ্না কখনোই কোন শিশুর ক্ষতি করতে পারবে না, সে ক্ষমতা ওর নেই।'

'তাহলে ওই সাথী কিভাবে খুন-খারাবি শুরু করেছিল?' এবার টিপ্পনী কাটলেন চেম্বার অভ কর্মাসের প্রেসিডেন্ট।

'সাথী কোন খুন করেনি!' ধৈর্য হারিয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন নাসির ওয়াজেদ। 'ওর সার্কিটে কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতেই এক বিজ্ঞানীকে আক্রমণ করে বসেছিল ঠিকই, কিন্তু অন্য সবাই সময়মত ওকে বিকল করে দিয়েছিল। সে প্রায় দু'বছর আগের কথা।'

নড়েচড়ে উঠলেন মন্ত্রী, সবাই চুপ হয়ে গেল। 'আপনার এই রোবট যে কোন মানুষকে আক্রমণ করবে না, তার গ্যারান্টি কি?'

'সাথীর প্রোগ্রামিং এরর ছিল, সেটা আমরা শুধরে নিতে পেরেছি। সাথীকে তৈরি করা হয়েছিল অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গিনী হিসেবে, যে কারণে তার প্রোগ্রামিং ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বপ্না কোন আবেগ অনুভব করে না। ফলে ভয়ের কিছুই নেই। প্রোগ্রামের বাইরে কিছু করার কোন ক্ষমতাই ওর নেই।' নির্বাক স্বপ্নার দিকে ফিরলেন নাসির ওয়াজেদ,

'স্বপ্না, বলো তো, তোমার কাজ কি?'

পাতলা গোলাপী ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, একটু যান্ত্রিক তবে অসম্ভব মিষ্টি গলায় স্বপ্না বলল, 'আমার দায়িত্বে যে সব বাচ্চারা থাকবে, আমি তাদের দেখাশুনা করব আর সবরকমের বিপদ থেকে রক্ষা করব।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে সবাই, লক্ষ্য করে মৃদু হাসলেন নাসির ওয়াজেদ। 'কোন লোক যদি বাচ্চাদের নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, যদি তাদের শারীরিক ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে স্বপ্না তাকে আক্রমণ করবে। তবে কোন মানুষকে প্রাণে মারার ক্ষমতা ওর নেই। কিডন্যাপার বা যে কোন দুর্বৃত্তকে সে আটকে রাখবে পুলিশ আসা পর্যন্ত।'

মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'বাচ্চারা নিজেরা যখন মারামারি করবে, তখন তো তাদেরকেই আক্রমণ করে বসবে মেয়ে···মানে রোবটটা।'

'না, স্বপ্না কোন বাচ্চাকে আক্রমণ করার ক্ষমতাই রাখে না। এটা ওর প্রোগ্রামিংয়ের প্রধান শর্ত। ও আক্রমণ করবে শুধু পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা মহিলাদের যারা বাচ্চাদের ক্ষতি করতে চাইবে।'

'আপনি বলছেন কাউকে প্রাণে মারার ক্ষমতা এর নেই, কিন্তু কিভাবে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবেন আপনি?' মন্ত্রী মহোদয়কে সন্তুষ্ট মনে হলো না।

'দাঁড়ান, হাতে কলমে দেখাচ্ছি।' পাশে দাঁড়ানো সহকারীর কানে কানে কিছু বললেন নাসির ওয়াজেদ। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের চটপটে যুবক, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে বসানো কাবার্ডের পাল্লা খুলে ভেতর থেকে বেশ বড়সড় একটা কাপড়ের তৈরি পুতুল নিয়ে এল। পুতুলটা শুইয়ে দিল টেবিলের ওপর। তারপর টিক কাঠের ভারী দরজাটা খুলে কাকে যেন ডাকল। খাকি ইউনিফর্ম পরা প্রায় ছ'ফুট লম্বা পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী এক লোক বিনীতভঙ্গীতে এসে সালাম জানাল সবার উদ্দেশ্যে। পরিচয় করিয়ে দিলেন নাসির ওয়াজেদ, 'এ হলো হাশেম মিয়া, আমাদের একজন সিকিউরিটি গার্ড।' স্বপ্নার দিকে ফিরলেন, 'মনে করো, এই পুতুলটা একটা বাচ্চা মেয়ে, তোমার কেয়ারে আছে।' কোন উত্তর দিল না স্বপ্না, নির্বাক চেয়ে রইল।

নাসির ওয়াজেদ চোখের ইশারা করতে পুতুলটার দিকে এগিয়ে গেল হাশেম মিয়া।

'থামুন!' একঘেয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠে বলে উঠল স্বপ্না। 'বাচ্চার পাঁচ ফিটের মধ্যে আসবেন না। আবার বলছি, কাছে আসবেন না। আদেশ পালন না করলে আপনাকে শাস্তি দেয়া হবে।'

থামল না হাশেম মিয়া, এগিয়ে গেল পুতুলটার আরও কাছে। কিন্তু খুব বেশি দূর যাওয়া আর হলো না, তার আগেই ক্ষিপ্র গতিতে পুতুল আর ওর মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্না। ডান হাতে ঘাড় ধরে মুহূর্তে শূন্যে তুলে ফেলল হাশেম মিয়ার অতবড় ধড়টা, তারপর দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে ধরল। বঁড়শীতে গাঁথা মাছের মত তড়পাচ্ছে হাশেম মিয়া। বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল চারদিক থেকে।

'ঠিক আছে, স্বপ্না, এবার ওকে ছেড়ে দাও,' মৃদু হেসে বললেন নাসির ওয়াজেদ।

ছেড়ে দিল স্বপ্না, ধপ করে মাটিতে পড়ল হাশেম মিয়া। ঘাড় ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল, মুখে বোকার হাসি।

'দেখলেন তো? হাশেম মিয়াকে শুধু আটকে রেখেছে স্বপ্না, ওর কোন শারীরিক ক্ষতি করেনি। আজকাল চারদিকে যেভাবে কিডন্যাপিং হচ্ছে, তাতে স্বপ্নার সার্ভিস আশীর্বাদের মতই মনে হবে ধনী বাবা-মাদের কাছে।'

চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, ব্যক্তিগত জীবনে যিনি একজন সফল শিল্পপতি, নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে জিনিসটা খুবই কাজের। ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার চিন্তায় আজকাল অনেক বাবা-মারই রাতের ঘুম হারাম হয়েছে। বিশ্বাসী কাজের লোক পাওয়াও এককথায় অসম্ভব। আমার মনে হচ্ছে আইডিয়াটা খুব একটা খারাপ না।'

এবারে প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী, 'আপনার আগের রোবটের এনার্জি-সোর্স ছিল খাবার-দাবার, যা সাধারণ মানুষ খায়। এটার বেলায়?'

'স্বপ্নাও আর দশটা মানুষের মত খাবার খায়, পানি পান করে। সেখান থেকেই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় এনার্জি। পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষের মত করেই তৈরি করা হয়েছে ওকে। বাইরে থেকে বোঝার

কোন উপায় নেই যে ও মানুষ নয়। ভাল করে লক্ষ করে দেখুন, ত্বকের জন্যে যে সিনথেটিক বেইজড্ মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাও দেখতে একদম জীবন্ত। স্পর্শ করলেও কোন তফাৎ বুঝতে পারবেন না।' পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিমোট কন্ট্রোল প্যানেল বের করলেন নাসির ওয়াজেদ। 'আর দশটা যন্ত্রের মত স্বপ্নাকেও যখন ইচ্ছে তখন অফ করে দেয়া যাবে। এই যে দেখুন, কত সহজে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায়।' রিমোট কন্ট্রোলটা স্বপ্নার দিকে তাক করে একটা বোতাম চাপলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে শাড়ির দোকানের শো-উইনডোতে সাজানো ম্যানিকিনের মত নিথর হয়ে গেল স্বপ্না।

আবার চাপা গুঞ্জন উঠল ঘর জুড়ে।

টেবিল চাপড়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন মন্ত্রী। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। 'ওয়াজেদ সাহেব, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ কোন সন্দেহ নেই। আপনি স্বপ্নাকে বাজারজাত করতে সরকারের অনুমতি চাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ-সরল নয়। বাজারজাত করার আগে এর ফিল্ড-টেস্ট করতে হবে। শুধু পরীক্ষার কারণে কোন শিশুকেই এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিতে পারি না আমরা। সরকার এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতে পারে না। দুঃখিত, ওয়াজেদ সাহেব, ফিল্ড-টেস্টের অনুমতি আপনি পাবেন না।' চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে দরজার দিকে রওনা হলেন মন্ত্রী।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' নাসির ওয়াজেদ কথা বলে উঠতে দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন মন্ত্রী, চোখে জিজ্ঞাসা। পরাজিত সেনাপতির মত আকুল নয়নে একবার সবার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন নাসির ওয়াজেদ, কিছুক্ষণ আগের প্রবল ব্যক্তিত্বের ছটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। বাঁ হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'আমি আমার নিজের বাড়িতেই ফিল্ড-টেস্ট করতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন চার বছরের একটা ছেলে আর তিন বছরের একটা মেয়ে আছে আমার। স্বপ্না ওদের দেখাশোনা করবে।'

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন মন্ত্রী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেক্ষেত্রে আপনাকে ছ'মাস সময় দেয়া গেল। এরমধ্যেই বোঝা যাবে রোবটটা কতটুকু নিরাপদ।'

দুই

বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ির পথে রওনা হলেন নাসির ওয়াজেদ। বারিধারার একপ্রান্তে ছিমছাম দোতলা 'ওয়াজেদ হাউস।' সামনে এক-টুকরো ফুলের বাগান, দু'একটা ফলের গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গেটে কোন দারোয়ান নেই, নাসির ওয়াজেদ টেকনোলজিতে বিশ্বাসী। ড্যাশবোর্ডে রাখা রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দিতেই ঘড়ঘড় শব্দ তুলে খুলে গেল নক্সা তোলা লোহার গেট। পিচঢালা ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাতেই লক্ষ্য করলেন গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রীর হালকা নীল টয়োটা স্টারলেট। গাড়ির মালিককেও দেখা যাচ্ছে গাড়ির পাশেই, স্বামীর গাড়ি ঢুকতে দেখে অপেক্ষা করছে। অফিস থেকে এইমাত্র বাড়ি ফিরেছে সাবিনা ওয়াজেদ। বাঁ হাতে একগাদা কাগজপত্র, কাঁধে ঝুলছে বড় ব্যাগ। ধূপরঙা একটা শাড়ি পরে আছে, মুখে হালকা প্রসাধন। দুর্দান্ত রকমের সুন্দরী সাবিনা। মোমের মত নিটোল শরীর, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। ধবধবে ফর্সা। ঈষৎ লালচে একমাথা চুল। সারাদিন অফিস করে ফিরেছে অথচ ক্লান্তির তিলমাত্র চিহ্নও শরীরের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বয়সের তফাতের কারণে অনেকেই সাবিনাকে নাসির ওয়াজেদের কন্যা বলে ভুল করে।

ওয়াজেদ গাড়ি থেকে নামতে মিষ্টি করে হাসল সাবিনা। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে আজ? তোমার ড্রাইভারই বা কোথায়?'

'দুপুরেই ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি, বাড়িতে কার যেন অসুখ। আজ একটু আগেই ফিরলাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।' গাড়ির পিছনের সিট থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিতে নিতে উত্তর দিলেন ওয়াজেদ।

'তোমার প্রেজেন্টেশন কেমন হলো? মন্ত্রী এসেছিলেন?' এগিয়ে গিয়ে ডোরবেল চাপ দিল সাবিনা, উঁচু গলায় ডাকল, 'নাসিমা! নাসিমা!'

'মন্ত্রী এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। অনুমোদন

পেতে আরও ঝক্কি পোহাতে হবে।'

'হায় হায়! তাহলে তো তোমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।' কথা বলতে বলতেই জোরে জোরে দরজা নক্ করল সাবিনা খানিকটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে।

'আরে এত সহজে কি আমি হাল ছাড়ি?'

ওদিকে ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছে নাসিমা। বিশ-বাইশ বছর বয়সের চালাকচতুর মেয়ে, ওয়াজেদ-দম্পতির বিশ্বস্ত গভর্নেস। গত তিন বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করছে সে বেশ সুনামের সঙ্গে, বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে ওকে। নাসিমার পেছন থেকে কলকল করতে করতে ছুটে এল পাপ্পু আর মিষ্টি। ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের আলিঙ্গনে। নাসিমার হাতে ব্যাগ আর কাগজপত্রগুলো ধরিয়ে দিয়ে দু'হাতে কোলে তুলে নিল ওদের সাবিনা, হুমহাম শব্দ তুলে চুমু খেল।

ভেতরে ঢুকে খোলামেলা হলঘরের মাঝখানে নামিয়ে দিল বাচ্চাদের, 'এবারে বলো দেখি, কি করলে তোমরা আজ সারাদিন?'

লাফিয়ে উঠল পাপ্পু। 'জানো, মাম্মি, নাসিমা আপু না আজ আমাদেরকে মজার একটা খেলা শিখিয়েছে!' হাততালি দিয়ে নেচে উঠল মিষ্টি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ! খেলার নাম গোল্লাছুট! হি হি হি! খেলার নাম গোল্লা!'

নাসিমা ব্যাগ আর কাগজপত্র যথাস্থানে রেখে আসার জন্যে রওনা হয়েছিল, নাসির ওয়াজেদ পিছন থেকে গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'নাসিমা, একটু দাঁড়াও!'

'জ্বী!' থমকে দাঁড়াল নাসিমা।

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে গোটা কতক পাঁচশো টাকার নোট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ওয়াজেদ। টাকাটা হাতে নিয়ে বিমূঢ় চোখে তাকাল নাসিমা, 'এত টাকা?'

'তোমাকে আর আমাদের দরকার হবে না, নাসিমা। আজ রাতেই তুমি চলে যাও এবাড়ি ছেড়ে। তোমার বেতন ছাড়াও বেশ কিছু টাকা আছে এখানে, লাগলে না হয় আরও কিছু দেব।'

'স্যার,' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল নাসিমা, 'আমি কি কোন দোষ করেছি? মানে...'

'না, দোষের কোন ব্যাপার নয়,' আবেগহীন কণ্ঠে বললেন ওয়াজেদ। 'তোমাকে আমাদের আর দরকার নেই। আর একটা কাজ জুটিয়ে নিতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না জানি, তবুও সাহায্য দরকার হলে বলো।'

অবাক হয়ে এতক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল সাবিনা, আর চুপ করে থাকতে পারল না, 'কি বলছ তুমি এসব? নাসিমাকে ছাড়া আমাদের চলবে কি করে?'

ভুরু কুঁচকে নতমুখী নাসিমার দিকে ফিরলেন ওয়াজেদ, 'বাচ্চাদের নিয়ে ভেতরে যাও!' মিষ্টি আর পাপ্পু এতক্ষণ মায়ের হাঁটু আঁকড়ে ধরে ভীত চোখে বাবার দিকে তাকিয়েছিল, নাসিমা ওদের নিয়ে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে। নাসিমাও জানে, এবাড়িতে নাসির ওয়াজেদের কথাই শেষ কথা।

'কি ব্যাপার, বলো তো?' সাবিনার কণ্ঠে চাপা ঝাঁঝ।

'সেটাই তো এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি।' টাইয়ের নট খুলতে খুলতে দোতলার সিঁড়ির দিকে রওনা হলেন ওয়াজেদ। অনুসরণ করল সাবিনা। 'কাশেমের মা আর তনুকেও বিদায় করে দিতে হবে আজই।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কাশেমের মা এবাড়িতে আছে কত বছর ধরে, ও ছাড়া রান্না করবে কে? কি হয়েছে তোমার, বলো তো?'

'সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে স্বপ্নাই সব কাজ করবে।'

'স্বপ্না!' আঁৎকে উঠল সাবিনা। 'তোমার ওই প্রোটোটাইপ! কিন্তু ওটা তো এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি!'

শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। কোট খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন ওয়াজেদ। বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, তুমি তা ভাল করেই জানো। স্বপ্নার কোন আবেগ নেই। সাথী অনেকটা মানুষের মতই কিছুটা আবেগ অনুভব করতে পারত, সেকারণেই গোলমাল বেধেছিল। স্বপ্নার ব্যাপারে সেটা হবে না। আমাদের বাড়িতেই স্বপ্নার ফিল্ড-টেস্ট হবে। নাহলে পুরো প্রজেক্ট বন্ধ করে দিতে হবে। তুমি জানো ইতিমধ্যেই কত টাকা ইনভেস্ট করেছি এ প্রজেক্টে। স্বপ্নাকে মার্কেটে নামাতে না পারলে আমি শেষ হয়ে যাব।'

'কিন্তু কাশেমের মা আর তনুকে বিদায় করার কি দরকার? বাচ্চা দুটোকে একা একা স্বপ্নার কাছে কিছুতেই দিতে পারব না!'

এগিয়ে এসে স্ত্রীর চোখে চোখ রাখলেন ওয়াজেদ, নরম গলায় বললেন, 'বাচ্চা রাখার কাজে মানুষের চেয়ে যন্ত্র অনেক বেশি পারদর্শী আর নির্ভরযোগ্য, তা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে, সাবিনা?'

'কিন্তু...' সাবিনার কণ্ঠে স্পষ্ট পরাজয়।

'কোন কিন্তু নয়। স্বপ্নাকে বাচ্চাদের সঙ্গে একা থাকতে দিতে হবে, ফিল্ড-টেস্টের ওটাই শর্ত। সেজন্যেই অন্য সব কাজের লোককে বিদায় করতে হচ্ছে। স্বপ্না সব কাজেই ওস্তাদ, তোমার কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না।'

কোন উত্তর দিল না সাবিনা, গম্ভীর মুখে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ওর দিকে মনোযোগ নেই ওয়াজেদের, ধরাচূড়া খুলতে ব্যস্ত। 'আর হ্যাঁ, কাল সকালেই জাভেদ স্বপ্নাকে নিয়ে আসবে। এটা তো জাভেদেরই প্রজেক্ট, জাভেদই সুপারভাইজ করবে।' কি মনে করে একটু থমকে গেলেন ওয়াজেদ। এগিয়ে গেলেন স্ত্রীর দিকে। 'জাভেদ বাড়িতে আসবে বলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো? ওহ্ হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার আপত্তির কোন কারণই তো নেই!' হেসে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন ওয়াজেদ।

জাভেদ আলম ইনোবোটিক্সের চীফ সায়েন্টিস্ট। অল্প বয়সেই রোবোটিক্স এনজিনিয়ারিঙে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে, যোগ্যতাবলেই সে আজ ইনোবোটিক্সের মাথা আর নাসির ওয়াজেদের ডান হাত। মানুষ চিনতে ভুল করেন না নাসির ওয়াজেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্র থাকাকালীন সময়ে জাভেদ আমেরিকান এক জার্নালে রোবোটিক্সের উপর একটা আর্টিকেল লিখেছিল, অনেকের চোখ এড়িয়ে গেলেও দূরদর্শী নাসির ওয়াজেদ ঠিক সময়েই বঁড়শী ফেলেছিলেন। ইনোবোটিক্সের স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা থেকে ডক্টরেট করে এসেছে জাভেদ, তবে ফিরে এসে প্রেমিকা সাবিনাকে আর ফিরে পায়নি। সাবিনার সঙ্গে ওর দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেম, সাবিনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়েকে আজ পর্যন্ত সে ভালবাসেনি। অথচ ওর সাময়িক অনুপস্থিতিতে সাবিনা মোহিত হয়ে

গেল নাসির ওয়াজেদের সামাজিক অবস্থান, প্রখর ব্যক্তিত্ব আর বৈভবের মোহে। জাভেদ আমেরিকা থেকে ফিরে আসার আগেই সাবিনা পরিণত হয়েছে সাবিনা ওয়াজেদে। প্রথমে ভীষণ ভেঙে পড়লেও জাভেদ ওদের কাউকেই দোষারোপ করেনি। বিনা প্রতিবাদে হার মেনে নিয়েছে। নাসির ওয়াজেদের মত লোকের কাছে পরাজয়ের মধ্যে কোন গ্লানি নেই। সাবিনা সুখে থাকলেই ও খুশি।

জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে সাবিনা। জাভেদের সঙ্গে বহুদিন কোন কথা হয় না। মাঝে মাঝে অফিসের কোন অনুষ্ঠানে কিংবা পার্টিতে দেখা হয়, কিন্তু প্রতিবারই জাভেদ ওকে এড়িয়ে গেছে। এ মুহূর্তে অবশ্য জাভেদের চেয়ে বাচ্চাদের জন্যেই বেশী চিন্তা হচ্ছে। বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে ছবি হয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে রইল সাবিনা।

তিন

সকালে একটু আগেই উঠে পড়ল সাবিনা। বাচ্চাদেরও তুলে দিল। ওদের হাতমুখ ধুইয়ে জামাকাপড় বদলে দু'গ্লাস অরেঞ্জজুস দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দিল। তারপর ঝটপট নিজে তৈরি হয়ে নিল। রান্নাঘরে এসে দ্রুতহাতে কয়েকটা ডিম পোচ করে ফেলল। টোস্টারে রুটির পিস্। সবকিছু টেবিলে সাজিয়ে দিতে দিতেই নাসির ওয়াজেদ নিচে নেমে এলেন। পরনে হালকা নীল সাফারী সুট, হাতে ব্রিফকেস, অফিসে যাবার জন্যে তৈরি।

নাস্তা শেষে চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। জাভেদ এসেছে। সাবিনা উঠে গিয়ে সুইচে চাপ দিয়ে বাইরের গেট খুলে দিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল জাভেদের অপেক্ষায়। নাসির ওয়াজেদ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, এদিকে লক্ষ করছে না। বাচ্চারা শান্ত হয়ে বসে আছে যার যার চেয়ারে, বাবার সামনে এমনিতেই ওরা কেঁচো হয়ে থাকে।

অফিসের ছোট্ট সুয্যুকি চালিয়ে এসেছে জাভেদ। প্যাসেঞ্জার সিটে

বেশ আকর্ষণীয় চেহারার স্মার্ট একটা মেয়ে, সাবিনা বুঝল ওটাই স্বপ্না। গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে একবার তাকাল জাভেদ, পরমুহূর্তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ওদের দু'জনকে ঘরে নিয়ে এল সাবিনা। নাসির ওয়াজেদ এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, 'এই যে জাভেদ, এসে পড়েছ সময়মতই। সাবিনা, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এই হলো স্বপ্না। মিষ্টি পাপ্পু, তোমরা কোথায় গেলে?'

ভীত চোখে পায়ে পায়ে মায়ের দু'পাশে এসে দাঁড়াল দু'ভাইবোন। স্বপ্নার দিকে ফিরলেন ওয়াজেদ, 'এই হলো মিষ্টি আর পাপ্পু, তুমি এখন থেকে এদের দেখাশোনা করবে।'

সুন্দর করে হাসল স্বপ্না, 'কেমন আছ তোমরা, মিষ্টি-পাপ্পু?' আজ ওর পরনে কচি কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি, চুলগুলো পনি-টেইল করে বাঁধা।

বাচ্চারা লজ্জা পেয়ে মুখ গুঁজল মায়ের আঁচলের নিচে। ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা, এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি।

'ভয় কি, পাপ্পু?' এক পা এগিয়ে এলেন ওয়াজেদ। 'তোমাদের এই স্বপ্না আন্টি কিন্তু মানুষ নয়, রোবট।'

এবারে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল পাপ্পু, নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল স্বপ্নার দিকে। 'সত্যি রোবট? টিভির মিস্টার রবুর মত?'

মৃদু হেসে ওকে কোলে তুলে নিল স্বপ্না, হাত বাড়িয়ে দিল মিষ্টির দিকে। 'বলো তো, মিষ্টি, তোমাদের প্লেরুমটা কোন দিকে?'

হাসিমুখে এগিয়ে এল মিষ্টি, 'চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি প্যাকম্যান খেলতে পারো?'

বাচ্চাদের নিয়ে প্লেরুমের দিকে চলে গেল স্বপ্না। শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাভেদ, 'উঃ! বাঁচা গেল! চিন্তায় ছিলাম যদি বাচ্চারা ওকে পছন্দ না করে।' একটা কফি টেবিলের উপর ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখল জাভেদ, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওটা নিয়ে।

'জাভেদ, তুমি তো সারাদিন এখানেই থাকবে, না?' অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল সাবিনা।

অবাক হলো জাভেদ। 'না। সেট আপ করে দিয়েই অফিসে ফিরে

যেতে হবে আমাকে।'

ব্রিফকেস হাতে এগিয়ে এলেন ওয়াজেদ। 'জাভেদ দিনে তিনবার করে আসবে প্রথম কিছুদিন, দেখে যাবে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। পরে তা আর দরকার হবে না। এই যে বাড়ির গেট আর দরজার চাবি।' জাভেদের দিকে একটা চাবির রিঙ ছুঁড়ে দিলেন। লুফে নিল জাভেদ।

'তাহলে আমি আজ আর অফিসে যাচ্ছি না, বাড়িতেই থাকব,' ঘাড় গোঁজ করে বলল সাবিনা।

প্রায় ধমকে উঠলেন ওয়াজেদ, 'বোকার মত কথা বোলো না! অফিস বাদ দিয়ে তুমি ক'দিন বাড়িতে বসে থাকবে?'

'যতদিন দরকার ততদিন। কিছুতেই ওদেরকে ওই রোবটটার হাতে একা ছেড়ে দেব না!'

'মুখে মুখে তর্ক কোরো না!' চীৎকার করে উঠলেন ওয়াজেদ। চমকে ঘুরে তাকাল জাভেদ, ভদ্রলোক ওর সামনেই স্ত্রীর সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করছেন! জাভেদের বিমূঢ় দৃষ্টি লক্ষ্য করে নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেন ওয়াজেদ। নিচু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'গতরাতেই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলেছি। আর মুখ খরচ করতে চাই না। ফিল্ড-টেস্টের শর্তই হলো স্বপ্নাকে বাচ্চাদের সঙ্গে একা থাকতে হবে। শুধু শুধু গোলমাল পাকাবার চেষ্টা কোরো না। তুমি ভাল করেই জানো এই প্রজেক্ট ভেস্তে গেলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে নামতে হবে আমাকে।' ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ অফিসের উদ্দেশে।

ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে সেই একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা। ধীর পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল জাভেদ, মমতায় ভিজে উঠেছে বুকের ভেতরটা। কতগুলো বছর কেটে গেছে মাঝে, অথচ দিনে দিনে যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছে সাবিনা। বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসটার গলা টিপে ধরে মারল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'ওয়াজেদ সাহেব তোমার সঙ্গে কি সবসময় এরকম ব্যবহার করেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' সাবিনার কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

দ্রুতহাতে অফিসের ব্যাগ গোছাচ্ছে।

'আমেরিকা থেকে ফিরে তোমাকে একদিন ফোন করেছিলাম, কোন কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলে তুমি। কেন, সাবিনা?' প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেলল জাভেদ। কত বছর পর আজ সাবিনার সঙ্গে কথা বলছে ও!

পূর্ণদৃষ্টি মেলে জাভেদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সাবিনা। লম্বা-রোগাটে চেহারা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা এলোমেলো চুল, চোখে ভারী চশমা, মেয়েলি ধাঁচের কোমল মুখ। এই শীতকালেও জিন্‌স্ আর সাদা শার্ট ছাড়া গায়ে কিছু নেই। এই গোবেচারা ভালমানুষ ছেলেটার সঙ্গেই সে প্রেম করেছে দীর্ঘ পাঁচটা বছর! 'জাভেদ, দয়া করে পুরনো দিনের কথা তুলো না। আমি এখন একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার সুখের সংসার।'

'সুখের সংসারের কিছুটা নজির তো দেখলামই!' জাভেদের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।

সাপের মত ফুঁসে উঠল সাবিনা। 'এবারে তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ! দয়া করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না!' পেন্সিল হিলে খটাখট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল সে।

সারাদিন অফিসের কাজে একটুও মন দিতে পারল না সাবিনা। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী সে। সিনসিয়ার কর্মী হিসেবে অফিসে ওর সুনাম আছে। কিন্তু আজ ওর মন পড়ে আছে বাড়িতে। খানিক পর পর ফোন করছে, কথা বলছে মিষ্টি আর পাপ্পুর সঙ্গে। তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। চারটা না বাজতেই বাড়ি ফিরে এল।

ফ্যামিলি রুমের সোফায় বসে গল্পের বই থেকে রূপকথা পড়ে শোনাচ্ছে স্বপ্না। মুখোমুখি দুটো মোড়ায় বসে উৎসুক মুখে শুনছে মিষ্টি আর পাপ্পু।

'রাজপুত্র প্রাণভোমরায় হাত দিতেই হাউহাউ ঘাউ করে ছুটে এল রাক্ষস।' দরজায় দাঁড়ানো সাবিনাকে দেখেছে স্বপ্না, কিন্তু কিছু বলল না। আপনমনে হাতে ধরা বই থেকে পড়ে যেতে লাগল, 'প্রাণভোমরার

একটা পাখা ছিঁড়ে ফেলতেই খসে পড়ল রাক্ষসের ডান হাত। অন্য পাখাটা ছিঁড়ে নিল রাজপুত্র, খসে গেল রাক্ষসের বাম হাত। তারপরেও ছুটে আসছে রাক্ষস, গগনবিদারী চীৎকারে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল...'

'সত্যি সত্যি ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল?' আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে এসেছে পাপ্পু।

'এটা গল্প। তিন-চোখা রাক্ষস বলে কোন প্রাণী পৃথিবীতে নেই, থাকলেও কোন প্রাণীর পক্ষে ভূমিকম্প শুরু করার মত ভেলোসিটি জেনারেট করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে শুধু শুধু বইতে এসব কেন লিখল?' পাপ্পুকে এখন একটু হতাশ মনে হচ্ছে।

'এটা শিক্ষণীয় গল্প। বাচ্চাদেরকে শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যেই এসব গল্প লেখা হয়েছে, পরিশ্রম আর সাহস ছাড়া কেউ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। বুঝলে?'

শুনতে শুনতে একটু অপ্রস্তুত বোধ করল সাবিনা। স্বপ্নার গল্প বলার ধরনটা একটু অদ্ভুত, কিন্তু এখন পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে সুস্থ এবং স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। দু'জনের হাতে প্রায় খালি দুধের গ্লাস, টেবিলে খালি প্লেট। ঠিক সময়মতই বিকেলের নাস্তা খেয়েছে ওরা। পরনে পরিষ্কার ধোয়া কাপড়, তারমানে স্বপ্না ঠিকমতই ওদের গোসল করিয়েছে। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে, কোন অসুবিধে হয়নি। অথচ তারপরেও মেনে নিতে কেন এত কষ্ট হচ্ছে?

রাত প্রায় এগারোটা। রাত্রিকালীন প্রসাধন সেরে বিছানায় অপেক্ষা করছিল সাবিনা, হাতে জন গ্রিশামের নতুন উপন্যাস। শোবার পোশাক পরে ওয়াজেদ ঘরে ঢুকতেই সাবিনা বইটা নামিয়ে রাখল। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

বিছানার পায়ের দিকে বসে হাতপায়ে লোশন ঘষছে ওয়াজেদ। 'কি? বলো।'

'রোবটটা কেমন যেন প্রাণহীন! যন্ত্রের মত।'

'যন্ত্র যন্ত্রের মত হওয়াই তো ভাল!' ওয়াজেদের চোখে কৌতুক।

'কিন্তু একটু আবেগ থাকলে মনে হয় বাচ্চাদেরকে আর একটু ভাল বাসতে পারত!'

ওয়াজেদের চোখে আর লঘু কৌতুকের চিহ্ন নেই, আছে শুধু ইস্পাতের কাঠিন্য। 'যেটা বোঝো না, সেটা নিয়ে তর্ক কোরো না। সাথী ওর পার্সোনালিটি-মডিউলের সঙ্গে মিল রেখে ডেভেলপ করা কিছু কৃত্রিম আবেগ অনুভব করতে পারত। সেজন্যেই গণ্ডগোল বেধেছিল। তুমি তো জানো, ল্যাবের এক বিজ্ঞানীর প্রেমে পড়েছিল সে—সেটাও ছিল গবেষণারই একটা অঙ্গ। কিন্তু একইসঙ্গে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল আর একজন মহিলা বিজ্ঞানীর প্রতি। ওর ধারণা ছিল সেই মহিলা ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যিই আক্রমণ করে বসেছিল। তেমন কোন ক্ষতি কারও হয়নি, কিন্তু সরকারী চাপের মুখে প্রজেক্টটা পুরো বন্ধ করে দিতে হলো। কিন্তু তুমি তো জানো, আমরা সাথীর প্রোগ্রামিঙের এই সামান্য ত্রুটি শুধরে নিয়েছিলাম খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু সরকারের অনুমোদন আর পেলাম না। আবেগ-ওয়ালা রোবট তৈরি করার অনুমতি আমরা আর পাব না, অন্তত আগামী দশ বছরের মধ্যে নয়।'

'কিন্তু এই প্রোটোটাইপ যে ভালবাসতে জানে না! বাচ্চাদের তো স্নেহ-ভালবাসার দরকার আছে।'

'বেশি বকবক কোরো না!'

'আমি বলছি তুমি বাচ্চাদের ক্ষতি করছ! মিষ্টি আর পাপ্পু কি তোমার গিনিপিগ?'

সপাটে চড় কষালেন ওয়াজেদ সাবিনার ফর্সা নিটোল গালে। 'হারামজাদী! আর একটা কথা বললে জিভ ছিঁড়ে নিয়ে আসব!' নিস্পন্দ সাবিনার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে রাগে গরগর করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওয়াজেদ। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কি ভেবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন একতলায়। পিছনের বারান্দার পাশের ছোট্ট রুমটায় থাকে স্বপ্না, সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। নক্ না করেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

ছোট্ট ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। খোলামেলা হালকা নীল নাইটি গায়ে, সামনের বোতাম খোলা। ডান হাত বাঁ

বগলের নিচে। আয়নায় অর্ধনগ্ন নারীদেহের মোহময় প্রতিবিম্ব।

ধীরপায়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়ালেন ওয়াজেদ, আলতো করে হাত রাখলেন কাঁধে। কামনায় জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। 'কি করছ?'

'লুব্রিকেটিং সিস্টেমটা অ্যাডজাস্ট করছি,' একঘেয়ে রিনরিনে কণ্ঠে উত্তর দিল স্বপ্না।

'জাভেদকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তাই তোমাকেই প্রশ্নটা করছি। তুমি কি শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'সাথীকে পূর্ণাঙ্গ একজন নারীর মত করেই ডিজাইন করা হয়েছিল। জাভেদ কি তোমাকেও সেভাবে ডিজাইন করেছে?'

'বাহ্যিকভাবে আমি যে কোন নারীর মতই।'

জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ ঘষলেন ওয়াজেদ। 'আহ্! কি মিষ্টি গন্ধ! কি সুন্দর শরীর তোমার!'

'আপনি কি করছেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।'

'তোমার তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে। দেখিয়ে দিলেই শিখে নিতে পারবে। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।' দু'হাতে স্বপ্নাকে কোলে তুলে নিলেন ওয়াজেদ, এগিয়ে গেলেন ছাপা চাদর ঢাকা নিভাঁজ বিছানার দিকে।

ওরা কেউ টের পেল না দরজার ঠিক বাইরে অন্ধকার বারান্দায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা। শিকারী বেড়ালের মত জ্বলছে চোখজোড়া।

চার

সকালে যথারীতি নাস্তার টেবিলে বসেছে ওরা। পরিবেশন করছে স্বপ্না। আলু-কপি-শিম মিশিয়ে খুব মজার একটা সব্জী রান্না করেছে স্বপ্না, চিজ দিয়ে ডিম ভেজেছে। সঙ্গে মুচমুচে পরটা।

'স্বপ্না দারুণ রান্না করে, না? গতকালের লাউ-চিংড়ীটা তো

একদম একনাম্বার!' কথা বলছেন ওয়াজেদ, চোখ খবরের কাগজে, হাতে কফির কাপ।

উত্তর দিল না সাবিনা। মন দিয়ে নাস্তা খাচ্ছে। কি মনে করে স্বপ্নাকে বলল, 'আমি আজ কফি খাব না, বরং চা দাও।'

আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্বপ্না। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়লেন ওয়াজেদ, সাবিনার গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসের উদ্দেশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ এল ওর কমপিউটার নিয়ে। যেন ওকে দেখেই তাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সাবিনা। অফিসের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্বপ্নার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি তাহলে। কোন কিছুর দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে ফোন কোরো, কেমন?'

'জ্বী,' এঁটো থালাবাসন গোছাতে গোছাতে উত্তর দিল স্বপ্না।

দরজা ছেড়ে নড়ল না জাভেদ, ওর সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সাবিনা। অবাক চোখে ওকে দেখছে জাভেদ। খোলা চুল দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর ফর্সা গালে আঙুলের লালচে দাগ! নিজের অজান্তেই হাত বাড়াল জাভেদ, 'কি হয়েছে, সাবিনা? ওটা কিসের দাগ?'

চমকে পিছু হটল সাবিনা। চকিতে পিছু ফিরল। না, স্বপ্না ওদের দিকে পিছন ফিরে আছে, ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। মিষ্টি-পাপ্পুও নাস্তা খেতে খেতে স্বপ্নার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে সাবিনা বলল, 'বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম!'

'আশ্চর্য! এমন সুন্দর মুখটায় কেউ আঘাত করতে পারে? সাবিনা, ওয়াজেদ সাহেব মানুষ না, পশু!'

'সত্যি?'

'সত্যি? কি সত্যি?'

'ওই যে তুমি বললে আমার মুখটা সুন্দর। সত্যিই কি আমার মুখটা সুন্দর?'

'কিভাবে বোঝাই, সাবিনা! দিনদিন তুমি আরও সুন্দর হচ্ছ।' নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। আস্তে করে জাভেদ বলল, 'কেন তুমি আমাকে নিজের মুখে কিছু বলোনি? আমাকে বললে কি

আমি বুঝতাম না?'

'জানি না, জাভেদ। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। কোন উত্তর নেই আমার কাছে। ক্ষমা করে দিয়ো। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে।' ঘি রঙের আঁচল উড়িয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সাবিনা। টয়োটা স্টারলেট স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী গতিতে ধেয়ে গেল গেটের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে দিল জাভেদ। ল্যাপটপ সহ এসে বসল ডাইনিং টেবিলে।

'স্বপ্না আন্টি, আজ আমরা গোল্লাছুট খেলব, কেমন?' চিজমাখা টোস্টে কামড় বসাল পাপ্পু।

'না, ও খেলাটা আমি জানি না। তারচেয়ে বরং প্যাকম্যান খেলি, চলো।' সিঙ্কে প্লেট ধুতে ধুতে জবাব দিল স্বপ্না।

'প্যাকম্যান তো কাল খেললামই!'

এবার তাল দিল মিষ্টিও, 'আমরা গোল্লাছুট খেলব! গোল্লাছুট খেলব!'

হাসল জাভেদ। 'ঠিক আছে। তোমরা গোল্লাছুটই খেলবে। তার আগে স্বপ্না আন্টির সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ হয়ে গেলেই আমরা সবাই মিলে গোল্লাছুট খেলব, ঠিক আছে?'

খুশিতে জাভেদকে জড়িয়ে ধরল মিষ্টি, 'সত্যি সত্যি তুমি খেলবে আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ, মা, খেলব।' পরম আদরে তুলতুলে শরীরটা বুকে জড়িয়ে ধরল জাভেদ। 'শুধু আধাঘণ্টা সময় দাও আমাকে, স্বপ্না আন্টিকে খেলাটা শিখিয়ে দিতে হবে তো!'

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল জাভেদ। গোল্লাছুট খেলে স্বপ্না বাদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বাকি সবাই। জাভেদকে ছাড়তে চাচ্ছিল না বাচ্চারা, ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে গেল। প্রতিদিন দশটার সময় দুধ-বিস্কুট খায় বাচ্চারা। দু'জনের সামনে বিস্কুটের প্লেট আর দুধের গ্লাস দিয়ে স্বপ্না ওদের বসিয়ে দিল ডাইনিং টেবিলে।

মুখ বাঁকাল পাপ্পু। 'দুটো মাত্র বিস্কুট! নাসিমা আমাদের তিনটে

করে দিত।'

'তিনটে চকলেট-চিপ বিস্কুটে রয়েছে আট পয়েন্ট তিন গ্রাম চিনি আর বারো পয়েন্ট চার গ্রাম ফ্যাট। এই অল্প বয়সেই ফ্যাট আক্রমণ করবে তোমাদের আর্টারি। বুড়ো হবার অনেক আগেই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হবে। দুটোর বেশি বিস্কুট একসঙ্গে কিছুতেই খাওয়া যাবে না।' নির্বিকারচিত্তে রান্নার আয়োজনে লেগে গেল স্বপ্না। লক্ষ করল না গপাগপ নিজের বিস্কুট দুটো খেয়ে নিল পাপ্পু। তারপর মিষ্টির প্লেট থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা বিস্কুট। নিয়েই আর দেরি করল না, ছুট লাগাল প্লেরুমের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে পিছু নিল মিষ্টি, করিডরের মাঝামাঝি এসে ধরে ফেলল ভাইকে। তারপর শুরু হলো হুটোপুটি। পাপ্পু আকারে একটু বড়, নিমেষেই মিষ্টিকে ফেলে দিল মাটিতে, জাপটে ধরে রেখেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে দু'জনেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল স্বপ্না। মিষ্টি আর পাপ্পুর দু'হাত ধরে এক ঝটকায় আলাদা করে ফেলল। ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল ওরা দু'জনই। ভ্রূক্ষেপ না করে ওদের টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। ওদের যার যার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুই দরজার মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে পিঠ সোজা করে বসল। বন্ধ দরজার ওপাশে যার যার নিজের ঘরে বসে আকুল হয়ে কাঁদছে মিষ্টি আর পাপ্পু। সে কান্না স্পর্শ করতে পারল না স্বপ্নার নিরেট হৃদয়।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ফিরল সাবিনা। বাগানে বা একতলার কোথাও বাচ্চাদের না দেখতে পেয়ে শঙ্কিতচিত্তে উঠে এল দোতলায়, চীৎকার করে ডাকছে বাচ্চাদের নাম ধরে। করিডরে চেয়ার পেতে বসে থাকা স্বপ্নার দিকে তাকাল অবাক হয়ে। 'কি ব্যাপার? বাচ্চারা কোথায়?'

'ওদের ঘরে। পরস্পরের নিরাপত্তার জন্যে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওদের আচরণ। ওদের আলাদা থাকাই ভাল।'

ওদিকে মায়ের সাড়া পেয়ে আবার কান্না শুরু করল মিষ্টি আর পাপ্পু। ছুটে গিয়ে দরজা দুটো খুলে দিল সাবিনা, মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চাদুটো। সাবিনাকে অবাক করে দিয়ে এক ঝটকায়

মিষ্টিকে তুলে নিল স্বপ্না, পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজের শরীরে আড়াল করে দাঁড়াল।

'কি? হচ্ছেটা কি? ওকে ছেড়ে দাও!' রাগে দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সাবিনা।

'না। ওদের দু'জনকে একসঙ্গে রাখা যাবে না। নিরাপত্তার অভাব। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্ভাবনা আছে ওরা আবার মারামারি করবে,' একঘেয়ে যান্ত্রিক গলায় বলে গেল স্বপ্না। একহাতে পিছনে ঠেলে ধরে আছে কাঁদতে থাকা মিষ্টিকে।

'আমি বলছি ওকে ছেড়ে দাও!' এবারে ধমকে উঠল সাবিনা। 'বাচ্চাদের বাবা-মায়ের আদেশ শুনতে বাধ্য তুমি।'

'বাবা-মা যদি ওদের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে বাবা-মায়ের আদেশ শুনতে বাধ্য নই আমি।'

আর সহ্য করতে পারল না সাবিনা, জোর করে কেড়ে নিতে গেল মিষ্টিকে। নিমেষে বাঁ হাতে ওর গলা ধরে শূন্যে তুলে ফেলল স্বপ্না, চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। ওদিকে মড়াকান্না জুড়েছে পাপ্পু আর মিষ্টি। ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে রইল সাবিনা, অসহায়ের মত ঝুলছে দেয়াল থেকে।

হঠাৎ টের পেল মূর্তির মত নিথর হয়ে গেছে স্বপ্না, কমে গেছে গলার ওপর চেপে বসা হাতের চাপ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সিঁড়ির ল্যানডিঙে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াজেদ। ওয়াজেদের হাতে রিমোট কন্ট্রোল, সোজাসুজি স্বপ্নার দিকে তাক করা। সাময়িকভাবে স্বপ্না এখন বিকল।

স্বপ্নার হাতের বাঁধন থেকে নিজেই বেরিয়ে এল সাবিনা। বাচ্চাদের বুকে তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। একবারও তাকাল না ওয়াজেদের অপরাধী চোখের দিকে।

পরদিন সকালে জাভেদ ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্বপ্নাকে নিয়ে। স্টাডিরুমের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে স্বপ্নাকে। ওর মাথার পেছনদিকের খুলিটা খুলে ফেলেছে জাভেদ, একগাদা তার আর যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে মগজের জায়গায়। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

'আর.থ্রী.কে-র তিন নম্বর কোড অনুযায়ী বাচ্চাদের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করেছি আমি,' জাভেদের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে বলল স্বপ্না। চুল এবং খুলিহীন অবস্থায় এখন আর ওকে মানুষের মত দেখাচ্ছে না।

'তোমার কোড একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি। এখন থেকে কোন অবস্থাতেই মা-বাবার আদেশের বাইরে যাবার ক্ষমতা তোমার থাকবে না।' খুলির ভেতরের তারের জঙ্গল থেকে ব্যাটারির মত দেখতে একটা ক্যাপসুল বের করে নিল জাভেদ। ল্যাপটপের কী-বোর্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওর দু'হাতের আঙুল।

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সাবিনার দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হাসলেন ওয়াজেদ, 'দেখো, আর ওরকম হবে না।'

'জাভেদ,' কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছে সাবিনা, 'ওটাকে তুমি ল্যাবে ফেরত নিয়ে যাও।'

'আরে, ভয়ের কি আছে? দেখছ তো জাভেদ বদলে দিচ্ছে ওর প্রোগ্রামিং,' নরম গলায় বললেন ওয়াজেদ।

'না, ওটাকে আমি এবাড়িতে রাখব না।'

'ছেলেমানুষী কোরো না!' প্রায় ধমকে উঠলেন ওয়াজেদ, স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। শোবার ঘরের বিছানায় ছুঁড়ে ফেললেন সাবিনার হালকা দেহটা। 'আর কত নাটক করবে? বলেছি তো, কিছুতেই এ পর্যায়ে প্রোজেক্টটা বানচাল হতে দেয়া যাবে না!'

'তাহলে আমিও আজ থেকে বাড়িতে থাকব!'

প্রচণ্ড জোরে ওকে মারলেন ওয়াজেদ, একরাশ বাসি জুঁইফুলের মত বিছানার এক কোণে এলিয়ে পড়ল সাবিনা। 'কতবার আর বলব, এই প্রোজেক্ট মার্কেটে নামাতে না পারলে দেউলিয়া হয়ে যাব আমি। এটা আমার জীবন-মরণের ব্যাপার।'

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে জাভেদ ওর কাজ শেষ করল। দু'একবার পরীক্ষা করে দেখল, প্রোগ্রাম ঠিকমতই কাজ করছে। হৃষ্টচিত্তে অফিসের উদ্দেশে রওনা হলেন ওয়াজেদ, দরজার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সাবিনা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। 'কি হলো? অফিসে যাবে না? এমনিতেই এক ঘণ্টার বেশি দেরি হয়ে গেছে!'

সাবিনাকে একবার দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল জাভেদ, বলল, 'আমি কিন্তু আজ সারাদিনই এ বাড়িতে থাকব, আপনারা কেউ বাড়ি ফেরা পর্যন্ত। নতুন প্রোগ্রামিং, কয়েক ঘণ্টা অবজার্ভ করা দরকার।'

চোখের নিরব ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে গেল সাবিনা। শ্রাগ করে ওর পিছু নিলেন ওয়াজেদ।

রাত এগারোটা দশ। ঠিক বিশ মিনিট আগে স্বপ্নার ঘরে ঢুকেছেন ওয়াজেদ। শোবার ঘরের আলো নিবিয়ে সোফায় দু'পা তুলে বসে আছে সাবিনা। পরনে পাতলা লেসের কালো নাইটি। ফরাসী সুগন্ধী ছড়িয়েছে শরীরের আঁকেবাঁকে। অপেক্ষা করছে সাবিনা।

ঘরে ঢুকে স্ত্রীর দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা বিছানায় চলে গেলেন ওয়াজেদ।

'তুমি কি চাও, বলো তো? কেন ওই রোবটটাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ?'

চাদর সরিয়ে বালিশ দুটো ঠিক করতে করতে অন্ধকারে ওকে দেখার চেষ্টা করলেন ওয়াজেদ। 'তুমি তো জানো কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ট্রায়াল এটা।'

'তুমি কি আমাকে আর ভালবাস না?'

'কি বলছ এসব, সাবিনা?'

'এই প্রোটোটাইপটা দেখতে একদম সাথীর মত। সাথীর চেহারাটা তোমারই ডিজাইন করা। তোমার চোখে ওটা আমার চেয়েও অনেক সুন্দর, তাই না?'

শুয়ে পড়েছেন ওয়াজেদ। ঘুমঘুম গলায় বললেন, 'কি যা তা বলছ! সাথীকে তৈরি করার সময় একসঙ্গে বারোটা বডি বানানো হয়েছিল। সেগুলো এখনও সব ল্যাবেই পড়ে আছে। বাজেটের কথা চিন্তা করে জাভেদ ওখান থেকে একটা বডি ব্যবহার করেছে স্বপ্নার জন্যে, ওতে আমার কোন হাত ছিল না।'

'আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই না? মূর্তির মত আবেগহীন ওই রোবটটাকে তুমি আমার জায়গায় বসাবে!'

'বাজে বোকো না তো! ঘুমাতে দাও!' পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন

ওয়াজেদ।

যথারীতি জাভেদ বসে আছে ল্যাপটপ নিয়ে। সাবিনা-ওয়াজেদ অফিসে চলে গেছে। স্বপ্না ডাইনিং টেবিলে মিষ্টি আর পাপ্পুকে নাস্তা খাওয়াচ্ছে বেশ অধ্যবসায়ের সঙ্গে। পাপ্পুর ঘুম এখনও ভাল করে কাটেনি, খেতে প্রবল অনীহা।

'আচ্ছা, স্বপ্না আন্টি, মাঝে মাঝে মাম্মি কাঁদে কেন?' চোখ ঘষতে ঘষতে প্রশ্ন করল পাপ্পু।

'কান্না একটা শারীরিক প্রক্রিয়া,' একটু চিন্তা করে উত্তর দিল স্বপ্না। জাভেদ কান পেতে শুনছে।

'আব্বু কেন মাম্মিকে কাঁদায়?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না, আর একটু অন্যভাবে প্রশ্নটা করো।'

'আব্বু কেন মাম্মিকে মারে?'

'দুঃখিত, এই তথ্য আমার জানা নেই। তোমার আব্বুকে জিজ্ঞেস করো, উনিই জবাব দিতে পারবেন।'

বিকেলে যথাসময়েই বাড়ি ফিরল সাবিনা। বাগানে স্বপ্নার সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলছে বাচ্চারা। পর্চে জাভেদের সুয্যুকি। ঘরে ঢুকতেই ল্যাপটপে ব্যস্ত জাভেদের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। হাসল সাবিনা, 'কখন এলে?'

'এই তো, মিনিট দশেক।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাভেদ। 'যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই।'

কাঁধের ব্যাগটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানির জগ বের করতে করতে চকিতে একবার ওকে দেখে নিল সাবিনা। 'বলো, কি?'

'সকালে পাপ্পু স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করছিল আব্বু কেন মাম্মিকে মারে।'

পানির গ্লাস হাতে থমকে গেল সাবিনা। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল একটুক্ষণ, তারপর খুব নিচু গলায় বলল, 'উত্তরে স্বপ্না কি বলল?'

'স্বপ্না কিন্তু যে কোন মানুষের মতই উত্তর দিয়েছে। ও কিছু জানে না, আব্বুই বলতে পারবে।'

কিছু বলল না সাবিনা। সিঙ্কের কল ছেড়ে চায়ের পানি ভরতে

লাগল কৌতূহলে।

এগিয়ে এল জাভেদ, উৎকণ্ঠিতে চেয়ে আছে সাবিনার দিকে। 'ওয়াজেদ সাহেব কি তোমাকে প্রায়ই মারধর করেন?'

সাবিনা নিজের কাজে ব্যস্ত। চায়ের কাপ রেডি করছে। 'ওটা এমন কোন ব্যাপার না।'

রাগ সামলাতে পারল না জাভেদ, ওর কাঁধ ধরে এক ঝটকায় নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাল। 'কি বলছ তুমি, সাবিনা? এই অপমান সহ্য করছ কেন?'

ম্লান হাসল সাবিনা। 'আমার বাচ্চারাই আমার সব, আমি তো কেউ না!'

জোরে ঝাঁকুনি দিল জাভেদ। 'কোথায় গেল তোমার সেই ব্যক্তিত্ব, সাবিনা? কেন তুমি এভাবে নিজেকে ছোট করছ?'

বিদ্রূপের হাসি সাবিনার ঠোঁটের কোণে। 'তুমি হলে আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে?'

একটু থমকে গেল জাভেদ। 'তুমি জানো তোমাকে কতটা ভালবাসি আমি। আমি ওয়াজেদ সাহেবের মত পশু নই।'

'তুমি কি ভালবাসতে আমাকে?'

'সারাজীবন, সাবিনা, সারাজীবন! একটা দিনের জন্যেও আমার ভালবাসা কমেনি।'

কাছে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে সাবিনা, বুকে মাথা রেখে বাচ্চা মেয়ের মত বলল, 'একটু আদর করবে আমাকে?'

ছিটকে দু'পা পিছিয়ে গেল জাভেদ, প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করছে। 'তা হয় না, সাবিনা। তুমি আর একজনের বিবাহিতা স্ত্রী, আমার বসের স্ত্রী।'

'দুঃখিত, কিছু মনে কোরো না।' দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সাবিনা। দু'হাতে মুখ ঢেকে সোফায় এলিয়ে পড়ল জাভেদ। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। মনে হচ্ছে যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছে ওর শরীরের ভেতরটা। একি আনন্দ? না দুঃখ? সাবিনা ওকে ভোলেনি! সাবিনা ওকে এখনও ভালবাসে!

পাঁচ

দুপুর ঠিক একটায় জাভেদের সুয্যাকি এসে থামল ওয়াজেদ হাউজের পর্চে। জাভেদ জানে এসময় পাপ্পু আর মিষ্টি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে ঘুমায়। স্বপ্না ঘরদোর ঝাড়ামোছা করছে।

স্বপ্নাকে লিভিং-রুমে ডাকল জাভেদ।

পিঠ সোজা করে সোফায় বসে স্বপ্না জানতে চাইল, 'ডেকেছেন কেন, স্যার?'

'আমার কয়েকটা তথ্য দরকার।'

'কি তথ্য?'

একটু ইতস্তত করে জাভেদ বলেই ফেলল, 'ওয়াজেদ সাহেব কি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন?'

'জ্বী, হাত তোলেন, মানে আঘাত করেন।'

'কিভাবে আঘাত করেন?'

'এ পর্যন্ত চারবার শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন। একবার টেবিল ঘড়ি ছুঁড়ে মেরেছেন। মিসেস ওয়াজেদ প্রায় প্রতিদিন রাতেই কান্নাকাটি করেন।'

আর সহ্য করতে পরল না জাভেদ। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ওয়াজেদ হাউজ ছেড়ে। সোজা ফিরে গেল ওর মগবাজারের ফ্ল্যাটে। কাজের ছেলেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, হয়তো বাইরে খেলছে অথবা ঘুমিয়ে আছে ওর ঘরে। এসময় জাভেদের বাড়ি ফেরার কথা না। ভালই হলো, এখন কারও মুখোমুখি হতে চায় না জাভেদ। একাকিত্ব! ওর দরকার নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্ব!

বেডরুমে এসে সাইডটেবিলের নিচের ড্রয়ার খুলল। পরম যত্নে তুলে নিল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি। ফিতে খুলে বিছানায় ছড়িয়ে দিল চিঠিগুলো। ছিটকে বেরিয়ে এল কয়েকটা ছবি। সেই কতকাল আগের মুখভর্তি কয়েকটা মুহূর্ত! মুখ উঁচু করে হাসছে সাবিনা,

কি নিষ্পাপ! কি সতেজ! অস্তগামী সূর্যের লালচে আলোয় রানীর মত দেখাচ্ছে ওকে! উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট! অস্নাত অভুক্ত জাভেদ পড়ে রইল একরাশ স্মৃতির মাঝখানে।

ছুটির দিনের সকাল। ঝলমলে সূর্য আকাশে। প্রজাপতির পেছনে বাগানময় ছোটাছুটি করছে পাপ্পু আর মিষ্টি। গার্ডেন চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সস্নেহে ওদের দেখছে সাবিনা। মাঝেমাঝে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। স্বপ্না কিচেনে রান্নায় ব্যস্ত। ছুটির দিনে সাবিনা পারতপক্ষে স্বপ্নাকে বাচ্চাদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

গেট দিয়ে জাভেদের সুয্যুকি ঢুকতে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাল সাবিনা। আজ জাভেদের আসার কথা নয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে জাভেদ। পরনে সেই চিরাচরিত জিন্স্ আর ঢোলা বাদামী শার্ট। অযত্নে বর্ধিত লম্বা চুলে আজ চিরুনি পড়েনি। চোখের কোলে কালি।

'ভাল আছ, সাবিনা?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখছে জাভেদ। সেই একইরকম সতেজ নিষ্পাপ মুখ, সদ্যস্নাত ভেজা চুলের ঢালে পিছলে যাচ্ছে রূপালী সূর্য। হালকা বেগুনী সালোয়ার-কামিজে ঢাকা কোমল শরীরটার কোথাও কোন মালিন্য নেই।

'এ সময় হঠাৎ তুমি? কি ব্যাপার?'

'তুমি ভাল আছ কিনা দেখতে এলাম। না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না।'

হাসল সাবিনা। 'আমি তো ভালই আছি। তোমাকেই বরং কেমন পাগল-পাগল দেখাচ্ছে।'

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন ওয়াজেদ। পরনে ঘরোয়া পোশাক, হাতে কফির কাপ আর খবরের কাগজ। জাভেদকে দেখে অবাক হলেন। 'আরে, তুমি এখানে কি করছ? আজ তো তোমার আসার কথা না!'

'স্যার, স্বপ্নাকে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে ল্যাবে নিয়ে যেতে হবে। ওকে নিতে এসেছি আমি।'

'কেন? ল্যাবে নেবার কি দরকার?'

'দু'একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। হঠাৎ করেই কাল

আবিষ্কার করলাম ভুলগুলো। মোটর স্কিল আর রেসপনসের ব্যাপার।'

'কই, আমি তো কিছু লক্ষ করিনি।'

'বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই শুধু ভুলগুলো বোঝা যায়। বিপজ্জনক কিছু নয় অবশ্য। তবুও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুধরে নেয়া ভাল।'

'যা ভাল বোঝো, করো।' কফির কাপ হাতে ফুলের বেড তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওয়াজেদ।

ইনোবোটিক্সের দোতলার বাঁ দিকের পুরোটা জুড়েই ল্যাব। ছুটির দিন বলে সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া আর কেউই নেই। উঁচু একটা টুলে বসে আছে স্বপ্না। মাথার পেছনটা খোলা। লাল-সবুজ-নীল তারের অরণ্যে ব্যস্ত জাভেদ। কপালে ঘাম, চোখে একাগ্র মনোযোগ।

'কি করছেন, স্যার?' স্বপ্নার প্রশ্নে চমকে উঠল জাভেদ। মাঝে মাঝে ওকে মানুষের মতই মনে হয়।

'তোমার প্রোগ্রামিং পরিবর্তন করছি।' কিছু বলল না স্বপ্না। দশ মিনিট পর জাভেদ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াজেদ সাহেব যখন সাবিনাকে মারধর করে, তখন তুমি কেন সাবিনাকে রক্ষা করো না?'

'আমার কাজ বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বাচ্চার বাবা-মায়ের নিরাপত্তা আমার দায়িত্ব নয়।'

ছোট্ট একটা কাঁচি দিয়ে দুটো তারের মাথা একসঙ্গে চেপে ধরল জাভেদ। 'বাচ্চাদের মায়ের বিপদ তো বাচ্চাদেরও বিপদ। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, স্যার। সেভাবে দেখতে গেলে মায়ের বিপদ তো সন্তানেরও বিপদ।'

খুশিতে প্রায় নেচে উঠল জাভেদ। 'তুমি কি স্বীকার করো যে ওয়াজেদ সাহেব বাচ্চাদের জন্যে বিপজ্জনক?'

'জ্বী, স্যার।'

'গুড গার্ল!' আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাভেদ যন্ত্রপাতি নিয়ে।

পাঁচ মিনিট পরে স্বপ্না বলে উঠল, 'স্যার, আপনি আমার সেফটি কোড ওভাররাইড করছেন।' কোন উত্তর না পেয়ে আবার বলল, 'হুঁ,

বুঝতে পেরেছি।' নির্বিকার চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল যন্ত্রমানুষ।

সময়মতই স্বপ্নাকে পৌঁছে দিল জাভেদ। বাড়িতে তখন কেউ নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছেন নাসির ওয়াজেদ। ওদের ফিরতে অনেক রাত হলো। ঘুমন্ত বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল ওয়াজেদ-দম্পতি। সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল স্বপ্না। ওকে দেখতে পেয়েই মেজাজ বিগড়ে গেল সাবিনার। কোন কথা না বলে সোজা দোতলায় শোবার ঘরে চলে গেল।

পোশাক পাল্টে শোবার ঘরে এসে ওয়াজেদ দেখলেন সাবিনা বাইরের সাজ নিয়েই বসে আছে সোফায়। স্বামী ঘরে ঢুকতেই ফুঁসে উঠল, 'জাভেদ ওই রোবটটাকে ফিরিয়ে না আনলেই ভাল করত।'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল ঝট্ করে। ধমকে উঠলেন ওয়াজেদ, 'একদম চুপ! কোন কথা নয়!'

'কেন, আমি কি তোমার দাসী-বাঁদী?'

'চুপ কর্ হারামজাদী!' সপাটে চড় কষালেন স্ত্রীর গালে, তারপর ছুঁড়ে দিলেন ওকে ঘরের কোণে। 'কতবার বলেছি এ ব্যাপারে আর একটা কথাও শুনতে চাই না!'

'স্যার, বাচ্চাদের জন্যে আপনার আচরণ বিপজ্জনক।' চমকে পিছু ফিরলেন ওয়াজেদ। স্বপ্না! কখন ঘরে এসে ঢুকেছে টের পাননি তিনি! মূর্তিমান বিভীষিকার মত এগিয়ে আসছে! 'আপনার সময় শেষ!'

ডুকরে কেঁদে উঠে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে গেল সাবিনা, দরজা লক করে দিল। আতঙ্কিত ওয়াজেদ পিছু হটতে লাগলেন। 'থামো, স্বপ্না! আমি তোমাকে আদেশ করছি, থামো!'

'আপনি বিপজ্জনক মানুষ! আপনাকে থামাতে হবে!'

ঝাঁপিয়ে পড়ে ড্রেসারের উপরে রাখা রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে লাল বোতামটা চাপলেন ওয়াজেদ। বারবার। আশ্চর্য! কাজ হচ্ছে না! রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়েই মৃত্যুবরণ করলেন নাসির ওয়াজেদ। স্বপ্না ওঁর ঘাড় মটকে দিয়েছে।

তিন মাস কেটে গেছে। ওয়াজেদ হাউজের জীবনযাত্রা আবার আগের

নিয়মে ফিরে গেছে। নাসিমা সেই আগের মতই বাচ্চাদের দেখাশুনা করে। বাড়ির অন্য কাজের লোক দু'জনও ফিরে এসেছে। এই তিনটে মাসের মধ্যেই যেন সব্বাই ভুলে গেছে স্বপ্না নামের রোবটটার কথা। নাসির ওয়াজেদের কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলার মতও কেউ নেই। মিষ্টি আর পাপ্পু ভুলেও কখনও আব্বুর কথা মনে করে না। গেটের ফলকেই শুধু ওয়াজেদ নামটা চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

জাভেদ আজকাল বেশির ভাগ সময় এ বাড়িতেই কাটায়। বাচ্চারাও আঙ্কেল বলতে অজ্ঞান। সেদিন বিকেলেও অফিস থেকে যথারীতি ওয়াজেদ হাউজে চলে এসেছে জাভেদ। সদ্যস্নাতা সাবিনা সিঁড়ি বেয়ে নামছিল নিচে, ওকে দেখে হাসল। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, অফিস থেকে ফেরার পর এখনও চা খাইনি। তোমার দেরি দেখে তাড়াতাড়ি গোসল সেরে নিলাম।'

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল জাভেদ। আধভেজা চুল আর প্রসাধনহীন, সতেজ মুখে কি নিষ্পাপ দেখাচ্ছে ওকে!

'কি হলো? কথা বলছ না যে?'

সাবিনার তাড়ায় চমক ভাঙল। লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'বাচ্চাদের দেখছি না যে? ওরা কই?'

'নাসিমা পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে ওদের। তুমি বরং হাতমুখ ধুয়ে নাও। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল সাবিনা চায়ের কাপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল জাভেদ।

'তোমার কি শরীর খারাপ নাকি?' সাবিনার চোখে উৎকণ্ঠা।

'কই, না তো! এমনিই টায়ার্ড হয়ে আছি। কাজের এত চাপ!'

'তাহলে চলো, ওপরে গিয়ে বিশ্রাম নেবে।'

কুঁকড়ে গেল জাভেদ, 'না না, থাক্! এখানেই গড়িয়ে নেব কিছুক্ষণ।'

কপট রাগে ভ্রূ কুঁচকাল সাবিনা। 'এখনও তোমার এত সঙ্কোচ?'

তাই তো, ভাবল জাভেদ, কিসের এই সঙ্কোচ? সবাই জানে ওদের বিয়েটা শুধু সময়ের ব্যাপার। সহজভাবে মেলামেশার পথে কোন বাধাই ওদের নেই। চায়ের কাপ হাতে উঠে দাঁড়াল জাভেদ, 'চলো

তাহলে, ওপরে যাই।'

সাবিনার শোবার ঘরে চলে এল ওরা। ছিমছাম সুন্দর করে গোছানো। দামী কাঠের আসবাব। রং মেলানো পর্দা আর বিছানার চাদর। বিছানায় আধশোয়া হয়ে হেডবোর্ডে হেলান দিল জাভেদ; চুমুক দিল চায়ের কাপে। বিছানার অন্য পাশে পা তুলে বসেছে সাবিনা। এত কাছ থেকে ওর শরীরের সুবাস এসে লাগছে নাকে। চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নিল জাভেদ। কি সাবান মেখেছে ও গায়ে? নাকি চুলের শ্যাম্পু?

'কি হলো, কথা বলছ না যে?'

খালি চায়ের কাপটা সাইড টেবিলে নামিয়ে রাখল জাভেদ, হাত বাড়িয়ে ছুঁলো সাবিনার সুগন্ধ মাখা আঙুল। বলল, 'কথা না বলেও তো অনেক কিছু বলা যায়।'

'দাঁড়াও, পর্দাটা টেনে দি। আলো পড়ছে তোমার চোখে।' উঠে গিয়ে পর্দা ঠিক করতে লাগল সাবিনা।

উঠল জাভেদও। জুতো খুলে ছুঁড়ে দিল খাটের তলায়। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে ড্রেসিংটেবিলের উপর রাখতে গেল। ঘড়ি রেখে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না; চোখ আটকে গেছে ঘড়ির ঠিক পাশেই রাখা ছোট্ট কালো একটা প্যানেলে। একটা রিমোট কন্ট্রোল! ইনোবোটিক্সের ছাপ জ্বলজ্বল করছে লাল বোতামটার ওপর। অবাক হয়ে রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিল জাভেদ, 'এটা এখানে কোত্থেকে এল?'

'ওটা তো ওয়াজেদের। সব সময় ড্রেসিংটেবিলেই থাকে। আমার ধরা নিষেধ।' স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল সাবিনা, পর্দা নিয়ে ব্যস্ত।

'এটা স্বপ্নার রিমোটকন্ট্রোল হতেই পারে না, ওটা আমি নিজে স্বপ্নার বডির সঙ্গেই নষ্ট করে ফেলেছি। তাহলে কোত্থেকে এল এটা?' বলতে বলতেই লাল বোতামটায় চাপ দিয়েছে জাভেদ। পরমুহূর্তেই শিউরে উঠল। যে অবস্থায় ছিল ঠিক সে অবস্থাতেই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে সাবিনা, প্রাণের কোন চিহ্নই নেই আয়ত চোখজোড়ায়!

এক লাফে ওর সামনে চলে এল জাভেদ। সরসর করে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘাড়ের কাছের কয়েকটা চুল। কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছে, মনে হচ্ছে এক্ষুনি বমি করে ফেলবে। কাঁপা কাঁপা হাতে বোতাম চাপল জাভেদ।

নড়ে উঠল সাবিনা। ঘনঘন কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল।

'হায় আল্লাহ্! তুমি মানুষ না!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল জাভেদ।

'আমি রোবট। কেন, তুমি জানতে না?'

'না···আমি কিছু বুঝতে পারছি না!' ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকল জাভেদ।

'বা রে,' মিষ্টি করে হাসল রোবটটা, 'তুমিই তো আমাকে তৈরি করেছ!'

'না···আমি তৈরি করেছিলাম সাথীকে! গোলমালের পর ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সাথীকে।'

'না, ওয়াজেদ সাথীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। সাথীর যন্ত্রপাতিই আছে আমার মধ্যে, শুধু চেহারাটা পরিবর্তন করে দিয়েছে ও। সাবিনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিল রেখে আমাকে রি-প্রোগ্রাম করেছে ওয়াজেদ। নাম দিয়েছে সাবিনা।'

'আসল সাবিনা কোথায়?'

'ওকে খুন করেছে ওয়াজেদ দেড় বছর আগে।'

'খুন করেছে! উঃ খোদা! ওয়াজেদ সাহেব সাবিনাকে খুন করেছে!' দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরল জাভেদ।

'আর ওয়াজেদকে খুন করেছ তুমি।' এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল রোবটটা, ভুবনমোহিনী হাসি হেসে বলল, 'আমাকে আদর করবে না? তুমি কথা দিয়েছ, সারা জীবন ভালবাসবে আমাকে।';

ধাক্কা মেরে ওকে সরিয়ে দিল জাভেদ। 'তুমিই আমাকে ফাঁদে ফেলেছ! উঃ! কি বোকা আমি!'

আবার এগিয়ে এল রোবট। 'কি নিখুঁত পরিকল্পনা, তাই না? পুরুষের কামনার সঙ্গিনী হিসেবেই তৈরি করেছিলে আমাকে, এ কাজ আমার চেয়ে আর কেউ ভাল পারে না, তা তো জানো। আমি স্বপ্নার মত আবেগহীনযন্ত্র নই, জাভেদ। আমি ওটার চেয়ে অনেক উন্নত, প্রায় মানুষের মতই। ওয়াজেদ আমাকে চায়নি। তুমি চেয়েছিলে। এখন আমি সম্পূর্ণ তোমার। আমাকে গ্রহণ করো, জাভেদ!' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে থাকল রোবটটা।

চীৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জাভেদ। ভূতে পাওয়া মানুষের মত ছুটতে থাকল উদ্দেশ্যবিহীন। ছুটতেই থাকল।

পুনর্জন্ম

এক

আকাশের কোণে শেষ লালিমাটুকুও মুছে গেছে একটু আগে, যে কোন মুহূর্তেই ঝুপ করে নেমে আসবে রাত। ডা. হাসান অসহিষ্ণুভাবে বারবার কব্জি বাঁকিয়ে ঘড়ি দেখছে। উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে ওর সহকারী ডা. কায়সারের মধ্যেও। দু'জনেই অধীর আগ্রহে ঘণ্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করছে গেটের পাশে। ঘণ্টাখানেক বলাটা ঠিক হলো না, আসলে ওরা অপেক্ষা করছে গত তিনটি বছর ধরে।

'ওই যে, আসছে!' উত্তেজনায় কেঁপে উঠল কায়সারের কণ্ঠস্বর।

সাদা একটা ভ্যান। হেডলাইটের বৃত্ত দুটো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ল্যাবকোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল হাসান। এই ডিসেম্বরের শীতেও দর দর করে ঘামছে সে।

কায়সার হাতের ইশারা করতে ভ্যানটা থামল। জানালা দিয়ে মাথা বের করল ড্রাইভার, 'মাল কোনহানে নামামু, স্যার?' ভ্যানের গায়ে লাল রঙে লেখা 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ।'

'ভেতরে নিয়ে আসতে হবে, ওই যে ওই টেবিলটার পাশে,' নির্দেশ দিল হাসান।

ভ্যান থেকে নেমে এল ড্রাইভার আর তার সঙ্গী। ধরাধরি করে ভ্যানের পিছন থেকে কফিনের মত দেখতে কাঠের একটা বাক্স নামাল। বাক্স থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে। গেট থেকে ভেতরে উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেল ড্রাইভার। বাইরে থেকে দেখতে গোডাউনের মত মন হলেও ভেতরটা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো, সিলিঙের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

"এই জাগাডা কি, স্যার? ডাক্তারখানা?'

'না। এটা একটা মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার,' বিরক্ত মনে হলো ডা. হাসানকে। 'একটু তাড়াতাড়ি করেন, ভাই।'

ড্রাইভার আর তার সঙ্গী ধরাধরি করে বাক্সটা এনে রেখে দিল হাসানের নির্দেশিত জায়গায়। ভ্যান থেকে লাল একটা খাতা নিয়ে এল ড্রাইভার, সই করার জায়গাটা দেখিয়ে দিল। অবাক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, 'মরা মাইনসের বডি দিয়া আপনেরা কি করবেন?'

উত্তর না দিয়ে মনোযোগ সহকারে খাতায় সই করল ডা. হাসান। ওয়ালেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিল, 'কষ্ট করলেন, ভাই সাহেবরা। এটা দিয়ে আপনারা চা খাবেন।'

সালাম জানিয়ে ওরা ভ্যানে ফিরে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল হাসান অপসৃয়মান ভ্যানের লাল টেইল-লাইটের দিকে। ডেমরার কাছাকাছি এ জায়গাটা শহরের ভীড় থেকে দূরে। আশেপাশে কিছু কলকারখানা আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর একেবারে তেপান্তরের মাঠ। কাজের জন্যে আদর্শ পরিবেশ। গত পাঁচ বছর ধরে এই গবেষণাগারে কাজ করছে হাসান আর তার সহকারী কায়সার। নামে সরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও বাজেটের সিংহভাগ আসে প্রাইভেট সেক্টার থেকে। মানবশরীরের মৃত টিস্যু পুনর্গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত আছে ওরা। তবে কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে বাইরের কারও কোন ধারণাই নেই। এমনকি মিনিস্ট্রির হোমরা-চোমরারাও তেমন কিছুই জানে না। প্রয়োজনের খাতিরেই এই গোপনীয়তা। এদেশে ধর্মোন্মাদ লোকজনের অভাব নেই। হাসান ওর সহকারী কায়সার ছাড়া আর কাউকেই এ ব্যাপারে এক তিল বিশ্বাস করে না। কায়সারের সঙ্গে ওর পরিচয় প্রায় পনেরো বছর আগে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে কায়সার ছিল ওর তিন বছরের জুনিয়ার। তখন থেকেই সে আকৃষ্ট হয় কায়সারের সততা আর কর্মনিষ্ঠার প্রতি। সময় এলে সে নিজেই কায়সারকে বেছে নিয়েছিল সহকারী হিসেবে। এই ক'বছরে ওদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে রূপ নিয়েছে।

পাতলা লেটেক্সের গ্লাভ্স্ পরতে পরতে কায়সারের চোখে চোখ রাখল হাসান, বলল, 'চল, তাহলে শুরু করা যাক।'

দুই

রিজুভিনেশন চেম্বারের প্ল্যাটফর্মে শুইয়ে রাখা হয়েছে হিমশীতল নগ্ন মৃতদেহটা। এয়ারটাইট কাঁচের ঢাকনার নিচে যেন মৃত নয়, ঘুমন্ত একটা মানুষ। যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত কায়সার, সময় এখন হীরের চেয়েও দামী।

স্টেপ্‌ল্ করা একগুচ্ছ কাগজে চোখ বুলাচ্ছে হাসান। 'রফিকুল আলম। বয়স—ছাপ্পান্ন। ম্যাসিভ করোনারী। কোন ধরনের সার্জারী হয়নি। তাৎক্ষণিক মৃত্যু। পারফেক্ট!'

একসারি সুইচ দ্রুতহাতে অন করতে করতে কায়সার জানতে চাইল, 'ঠিক কখন মারা গেছে?'

'এখনও বারো ঘণ্টা হয়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আইস-চেম্বারে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আশাকরি খুব বেশী সেল্ ড্যামেজ হয়নি। বাকি আমাদের ভাগ্য।'

ঘুরে দাঁড়াল কায়সার, অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শব্দ করে। 'আমি তৈরি।'

দ্রুতহাতে প্রোটেকটিভ গিয়ার পরে নিল দু'জনে, সম্ভাব্য রেডিয়েশনের জন্যে সতর্কতা। হাসান বুড়ো আঙুল তুলে ইশারা করতে প্রত্যুত্তরে বুড়ো আঙুল দেখাল কায়সার, বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বিসমিল্লাহ্!' বুড়ো আঙুলের ডগায় চেপে ধরল কন্ট্রোল প্যানেলের লাল বোতামটা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল যন্ত্রপাতিগুলো। সিলিং থেকে নিচে নেমে এল স্ক্যানিং প্যানেল। চোখধাঁধানো হালকা নীল আলো ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে কাঁচের ঢাকনার নিচে শোয়ানো মৃতদেহের ওপরে। কন্ট্রোল প্যানেলের লাল-সবুজ বাতিগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা দু'জন, চোখ পড়ে আছে মনিটরে।

ঠিক তিন মিনিট পর ভোজবাজীর মত থেমে গেল যন্ত্রপাতির গর্জন,

নিভে গেল আলোর বিচ্ছুরণ। মনিটরে চোখ রেখে হাসান বলল, 'সব ড্যামেজড্ সেল্‌ই রিপেয়ার হয়েছে। এবার ব্লাড রিপ্লেসমেন্ট সিস্টেমটা চালু করে দাও, কায়সার।'

দ্রুতহাতে প্রোটেকটিভ গিয়ার খুলে ফেলল ওরা দু'জনেই। মৃতদেহের এখানে সেখানে ফিট করা টিউবগুলো ভরে উঠতে শুরু করেছে পানির মত স্বচ্ছ আর লালচে সচল তরল পদার্থে।

ঠিক পনেরো মিনিট পরে মনিটরের দিকে চেয়ে লাফিয়ে উঠল হাসান, 'বডি টেম্পারেচার বাড়ছে! চুয়াত্তর পয়েন্ট দুই ডিগ্রী...অষ্টাশি পয়েন্ট চার...'

ঝট্ করে দু'জনে কালো চশমা পরে নিল। অভিজ্ঞ পিয়ানো-বাদকের মত দশ জোড়া আঙুল ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে কন্ট্রোল-প্যানেলে। নীলচে-সাদা বিদ্যুৎতরঙ্গ ঝলসে উঠল কাঁচের ঢাকনার নিচে।

সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে হাসান মনিটরের রীডিংসের দিকে। পাঁচ সেকেন্ড পর ফিসফিস করে বলে উঠল, 'কোন পরিবর্তন নেই!' পুরো গবেষণাগার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, এর মধ্যেও হাসান দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে।

'চারশোতে দিয়ে দেখি,' অনুমতি চাইল কায়সার। মুখে কিছু বলল না হাসান, শুধু মাথা ঝাঁকাল। কালো চশমার আড়ালে ওর চোখ ঢাকা, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হতাশার চিহ্ন স্পষ্ট।

সাপের মত কিলবিল করে উঠল আলোর রেখা। ভোজবাজীর মত নড়ে উঠল মৃতদেহের বাঁ হাতের কড়ে আঙুল!

'রিফ্লেক্স!' প্রায় চীৎকার করে উঠল কায়সার।

'মনে হয় না।' ধীর পায়ে এগিয়ে এল হাসান, শায়িত দেহের পাশে। কাঁচের ঢাকনা তুলে ঝুঁকে পড়ল ভেতরে। না, জীবনের কোন চিহ্নই নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল হাসান।

ঠিক তক্ষুনি শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল দেহটা। দীর্ঘদিন ধরে এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তারপরেও ভীষণ ভয় পেয়ে একপা পিছিয়ে গেল হাসান।

খাবি খাবার মত হাঁসফাঁস করছে, চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা।

ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে আছে লোকটা ওদের দিকে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' ফিসফিস করে বলল হাসান।

তিন

অক্সিজেনের নলটা বারবার সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন রফিকুল আলম। ছোট্ট বাচ্চার মত তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছে কায়সার।

'আপনারা কে, বলুন তো?' প্রায় ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি, লোহার বলের মত ভারী মনে হচ্ছে মাথাটা।

'এটা একটা প্রাইভেট মেডিকেল ফ্যাসিলিটি,' একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল হাসান। 'আপনি এখানে আমাদের কেয়ারে আছেন। আমি ড. হাসান আর ও ড. কায়সার।'

'আমি বাড়ি যাব,' উঠে বসার চেষ্টা করলেন রফিকুল আলম। গলা পর্যন্ত টানা কম্বলটা খসে পড়ল।

'আরে, দাঁড়ান দাঁড়ান, করছেন কি!' কায়সার জোর করে তাঁকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন তিনি, এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন তাঁর শরীরের সঙ্গে অসংখ্য যন্ত্রপাতি ফিট করা। 'আমার হার্ট অ্যাটাক করেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হাসান।

'আমার স্ত্রী...বাবলু...মলি...ওরা...'

'কোন চিন্তা করবেন না, আপনি একটু ভাল হলেই ওদেরকে দেখতে পাবেন।'

'অবস্থা কি খুব বেশী খারাপ?' শুকনো ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে, ফুলে গেছে লালচে চোখজোড়া। ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে।

'শুনুন,' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বসল হাসান। 'আপনাকে আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি, তা আজগুবি মনে হলেও আসলে বর্ণে

বর্ণে সত্যি। গত পাঁচ বছর ধরে আমি আর আমার সহকারী এখানে ক্রায়নিক সাসপেনশন নিয়ে গবেষণা করছি।'

রফিকুল আলমের বিমূঢ় দৃষ্টি লক্ষ্য করে কায়সার ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল, 'শুনেছেন বোধহয়, আজকাল বিদেশে মৃত্যুর পর অনেকেই নিজেদের মৃতদেহ ফ্রোজেন করে রেখে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি কখনও নতুন টেকনোলজির সাহায্যে পুনর্জীবন লাভ করা যায়, এই আশায়।'

'তারমানে আমার মৃত্যুর পর আপনারা আমার মৃতদেহ ফ্রোজেন করে রাখবেন!' ভয় পেয়েছেন রফিকুল আলম, ঘনঘন এদিকওদিক তাকাচ্ছেন।

'না না, তা নয়। আগে পুরো ব্যাপারটা শুনুন।' আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে রফিকুল আলমের বাহুতে হাত রাখল হাসান। 'বছর তিনেক আগে আমরা নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলি, যার সাহায্যে বিভিন্ন ভাইটাল অর্গানের মৃত টিস্যু মেরামত করা যায়। এ পর্যন্ত শুধু জীবজন্তুর উপরই আমরা পরীক্ষা করেছি, আশাতীত সাফল্যও পেয়েছি। মনটাকে একটু শক্ত করুন, আলম সাহেব। আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। আজ সকাল ঠিক আটটা বিশ মিনিটে আপনি ইন্তেকাল করেছেন। আপনার স্ত্রী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান যে আপনি আপনার মৃতদেহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে দান করে গেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজকে। এদেশে এতবড় মহৎ কাজ আর ক'জনে করে, বলুন! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহ ফ্রোজেন করে রাখা হয়। গত তিন বছর ধরে এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি আমরা। আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন রফিকুল আলম।

'তার মানে...আজ সকালে...'

'আপনার যদি কোনরকম সন্দেহ থাকে, ডেথ সার্টিফিকেটও আমার কাছেই আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন তিনি। তারপর জানতে চাইলেন, 'আমার স্ত্রী...বাড়ির লোকেরা কি জানে আমি বেঁচে উঠেছি?'

'না। আমরা তিনজন ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানে না।'

'যদি এখন বাড়িতে একটা ফোন করি, চিন্তা করে দেখেন তো কি একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে!' ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাঁর শুকনো ঠোঁটের কোণে।

হাসান আর কায়সার দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল কায়সার, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'একটা ব্যাপার আপনার জানা দরকার। আপনাকে আমরা রিভাইভ করেছি বটে, কিন্তু খুব সীমিত সময়ের জন্যে।'

চমকে উঠলেন তিনি। হতভম্ব হয়ে হাসানের দিকে তাকালেন।

উপরনিচে মাথা ঝাঁকাল হাসান। দৃষ্টিতে গভীর সমবেদনা। 'খুব বেশীক্ষণের জন্যে আপনাকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'ঠিক কতক্ষণ?' রফিকুল আলমের লালচে ফোলা চোখের কোলে ভয়ের ছায়া। 'পাঁচ বছর? এক বছর? কয়েক মাস? কি হলো, কথা বলছেন না কেন? কয়েক সপ্তাহ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কায়সার। 'সম্ভবত দিন দু'য়েক। কয়েক ঘণ্টা এদিক-ওদিক হতে পারে, তার বেশি নয়।'

রফিকুল আলমের ক্লান্ত চোখজোড়া পাথরের মত ভাবলেশহীন। বরফের মত শীতল তাঁর ডান হাতে হাত রাখল হাসান।

চার

একগাদা পিনাট-বাটার টোস্টে মাখাতে গিয়ে মুখে-হাতে একাকার করে ফেলেছে টুকটুক।

'দ্যাখো তো কাণ্ড!' বিরক্ত হবার বদলে মেয়ের বাটার-মাখা বিপন্ন চেহারা দেখে হেসেই বাঁচে না মিলি। ভেজা ন্যাপকিন দিয়ে যত্ন করে মুছে দিতে লাগল। 'নাস্তার টেবিলে এত দুষ্টুমি করো কেন বলো তো, টুকটুকি সোনা?'

'বা রে! দুষ্টুমি করলাম কখন?' পনি-টেইল দুলিয়ে আদুরে একটা ভঙ্গি করল ছ'বছরের মিষ্টি মেয়েটা। 'বেশী করে না খেলে যে বড়

হওয়া যায় না! তাই না, বাপি?'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে একগাদা কাগজে চোখ বুলাচ্ছে হাসান। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হুঁ। ঠিক বলেছ, মা।'

মিলি জানে হাসান স্ত্রী-কন্যার কথোপকথন কিছুই শোনেনি, ওর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। দশ বছরের বিবাহিত জীবন ওদের, অথচ হাসানকে এখনও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না মিলি। হাসান যেন এ বাড়িতে থেকেও নেই। কাজ ছাড়া ওর জীবনে কোন কিছুরই যেন গুরুত্ব নেই। মেয়েটাকে মিলি একাই মানুষ করছে বলতে গেলে। মাঝে মাঝেই হাসান টানা কয়েকদিন বাড়ি ফেরে না, গবেষণাগারেই পড়ে থাকে। প্রথম প্রথম মিলি আপত্তি করত। রাগ-অভিমান কান্নাকাটি সব অস্ত্রই প্রয়োগ করেছে, কোন লাভ হয়নি। তারপর টুকটুকের জন্মের পর ওকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, মেনে নিয়েছে হাসানের সংসারের প্রতি উদাসীনতা। তারপরেও মাঝে মাঝেই ভীষণ মন খারাপ করে, স্ত্রী হিসেবে ওর তো অনেক বেশি কিছু পাওয়ার ছিল। বিজ্ঞানীদের স্ত্রীদের কি সুখী হতে নেই?

শব্দ করে ফোন বেজে উঠল। নাস্তার প্লেটটা ঠেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ফোন ধরল হাসান। চায়ের কাপ হাতে ওকে দেখতে লাগল মিলি। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, কিন্তু হাসান ঠিক আগের মতই সুদর্শন। প্রায় ছ'ফিট লম্বা সুঠাম শরীর, চোখে ভারী চশমা, শুধু কানের দু'পাশের চুলে রূপালী আভাস। তাতে যেন ব্যক্তিত্বটা বেড়েছে।

স্ত্রীর চাহনি অবশ্য হাসানকে স্পর্শ করছে না। মনোযোগ দিয়ে ফোনে কথা বলছে সে, '...হ্যাঁ...শুধু মাইল্ড্ সিডেটিভ, আর কিছু না...কিছু করার নেই... কোনরকম সাইড রিয়্যাকশনের ঝুঁকি নিতে চাই না...হ্যাঁ... আমি আসছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল হাসান।

'কে, কায়সার ভাই?' জানতে চাইল মিলি। 'উনি তো বহুদিন এদিকে আর আসেন না। একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসো, ভাত খেয়ে যাবেন।'

বেডরুমের দিকে যেতে যেতে হাসান বলল, 'ঠিক আছে, ওকে বলব। একসেট ফ্রেশ শার্ট-প্যান্ট দাও তো, এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

'আজ ছুটির দিন, গত সপ্তায় তুমি মেয়েকে কথা দিয়েছ আজ

ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে।' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে অভিমানটুকু চেপে রাখতে পারল না মিলি।

'ওহ্ হো! একদম ভুলে বসেছি!' দ্রুত চুলের ভেতর আঙুল চালাল হাসান, এটা ওর বেকায়দায় পড়ার ভঙ্গি। 'কিন্তু আজ কেন, আগামী কয়েক দিনেও আমি সময় পাব না। বুঝলে, মিলি, সাংঘাতিক একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি আমরা। প্রায় সাফল্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। পরীক্ষাটা ভালভাবে শেষ হলেই তোমাকে সব খুলে বলব।'

'সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে মেয়েটাকে একটুও সময় দিচ্ছ না, সেটা কি ঠিক হচ্ছে? ওর স্কুলের ফাংশানেও গেলে না...' মিলির কণ্ঠে চাপা রাগ।

'প্লিজ, একটু বোঝার চেষ্টা করো...' বলতে বলতেই হাসান লক্ষ্য করল টুকটুক বেডরুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চট্ করে ওকে কোলে তুলে নিল। 'চিড়িয়াখানায় আর একদিন যাব আমরা, ঠিক আছে? আজ বরং তোমার জন্যে ওই লাল রঙের ইলেকট্রিক কারটা কিনে নিয়ে আসব।'

'তুমি যে কি না, বাপি!' হাসিমুখে বাবার নাক ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দিল টুকটুক। 'ওই লাল গাড়িটা তো আম্মি কবেই কিনে দিয়েছে!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিল হাসান। বেরুবার মুখে আলমারি থেকে বের করে একটা বাদামী চামড়ার বাক্স দিল মিলি ওর হাতে, মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি আজও অনেক রাত করবে ফিরতে। এটা সঙ্গে রাখো, তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হই আমি।'

চামড়ার বাক্সে ছোট্ট একটা বেরেটা আছে, জানে হাসান। মিলিই জোর করে লাইসেন্স করিয়েছে, ওর এক মিলিটারি মামাকে দিয়ে কিনিয়ে এনেছে। মাস ছ'য়েক আগে এক রাতে গবেষণাগার থেকে ফেরার পথে একদল ডাকাতের হাতে পড়েছিল হাসান। রাত প্রায় দুটো, রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় হাসান। ঘড়ি-মানিব্যাগ তো গেছেই, বেধড়ক মার খেয়ে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সারারাত। সেখান থেকে হাসপাতালে দশদিন। বাড়ি ফিরে জেনেছিল গাড়ির খোলশটা ছাড়া আর কিছুই তারা রেখে যায়নি।

মিলিকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই শুধু আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে রাজী হয়েছে হাসান, কোনদিন ওটা ব্যবহার করার কথা চিন্তাও করে না। বেশীরভাগ সময় আলমারিতেই তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে জিনিসটা।

কথা না বাড়িয়ে বাক্সটা নিল হাসান। গাড়িতে উঠে গ্লাভ্‌স্ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল। তারপর বেমালুম ভুলে গেল ওটার কথা।

পাঁচ

টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে কায়সার। হাসান শব্দ করে হাতের ব্রিফকেসটা টেবিলে রাখতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। ওর রাতজাগা ক্লান্ত চেহারা দেখে মায়া হলো হাসানের।

'কি খবর, কায়সার? পেশেন্ট কেমন আছে?' বলতে বলতে বিছানায় শোয়া রফিকুল আলমের দিকে এগুলো হাসান।

লম্বা একটা হাই চেপে কায়সার বলল, 'এখন ঘুমাচ্ছে। কিন্তু তখন আমি সত্যিই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর কতক্ষণ টিকবে কে জানে!'

'যতক্ষণই টিকুক না কেন, আমরা তো একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেললাম! সেটাই বড় কথা।' মনিটরের রীডিংগুলো পরীক্ষা করছে হাসান। 'বডি টেম্পারেচার দেখছি এখনও অনেক নিচে।'

'হাসান ভাই, ভদ্রলোক কাঁদছিলেন।'

'অস্বাভাবিক কিছু না, বরং সেটাই স্বাভাবিক।' রফিকুল আলমের বাহু আর ঠোঁটের কোণে লালচে দাগড়া দাগড়া দাগ ভেসে উঠেছে। মন দিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগল হাসান।

'আমার মনে হয় ওঁর বাড়িতে একটা খবর দিলে ভাল হয়।'

ঝট্ করে মাথা তুলল হাসান। 'অসম্ভব।'

'হাসান ভাই, চিন্তা করে দেখেন,' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল কায়সার, 'বাড়ির লোকজনকে কাছে পেলে হয়তো উনি মনে জোর পেতেন।'

'কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওঁর স্ত্রী যদি একবার জানতে পারেন, তাহলে আমও যাবে ছালাও যাবে। ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে। শেষ মুহূর্তে কিছুতেই এতবড় একটা ঝুঁকি নিতে পারব না আমরা। ওরা জানে ভদ্রলোক নিজের মৃতদেহ দান করে গেছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে, তার বেশী কিছু জানার কোন দরকার নেই।'

'কিন্তু একসময় তো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতেই হবে। সেজন্যে কাগজপত্রও ঠিক করা দরকার।'

'এই মুহূর্তে কাউকেই কিছু জানানো যাবে না। আগে পুরো এক্সপেরিমেন্টটা শেষ হোক। না হলে মিনিস্ট্রির গাড়লগুলোই সব ক্রেডিট নিয়ে নেবে...'

আচমকা ধনুস্টংকার রোগীর মত বেঁকে গেল রফিকুল আলমের অচেতন দেহটা, ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। লাফিয়ে উঠল কায়সার, দ্রুতহাতে ইনজেকশন রেডি করছে।

'কি দিচ্ছ?' মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে হাসান। বিপি নাইনটি ওভার সিক্সটি ফোর।

'ল্যানিকেইন। একশো এম.জি.,' বলতে বলতে ওষুধটা ইনজেক্ট করল কায়সার, সরাসরি হার্টে। পুরো সাত মিনিট ধরে যমে-মানুষে যুদ্ধ চলল। ঠিক ইলেকট্রিক শক দেবার আগের মুহূর্তে খুক-খুক করে কেশে উঠলেন রফিকুল আলম। বাঁশপাতার মত কাঁপছে শরীরটা।

'খুব শীত লাগছে...উঃ...' আধবোজা চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কায়সার তাড়াতাড়ি কম্বল টেনে দিল তাঁর গলা পর্যন্ত। শরীর দুমড়ে বেরিয়ে আসা কাশির ধাক্কা সামলাতে সামলাতে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'কেন...কেন এমন করে কষ্ট দিচ্ছ, বাবারা...আর যে সহ্য করতে পারছি না...'

একযোগে চমকে উঠল হাসান আর কায়সার। রফিকুল আলমের ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কাঁচা রক্ত।

*

'আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটরি সিসটেমটা খুলে নেয়া উচিত।'

মনিটর থেকে চোখ তুলে অবাক চোখে কায়সারের দিকে তাকাল হাসান, 'কি বললে?'

'এভাবে ওঁকে কষ্ট দেবার কোন মানেই হয় না।' জেদী কিশোরের মত অস্থির দেখাচ্ছে কায়সারকে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ সময় সাবজেক্টকে মেরে ফেলা মানে এতদিনের সব পরিশ্রমই জলে ফেলে দেয়া!'

'হাসান ভাই, আপনি যাকে সাবজেক্ট বলছেন, তাঁর একটা নাম আছে। এ অবস্থায় উনি বেঁচে থাকতে চাইছেন না। আমাদের উচিত ওঁকে সম্মানের সঙ্গে মরতে দেয়া।'

'থামো, কায়সার,' ধমকে উঠল হাসান। 'এটা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। আমরা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট একটা অবদান রাখতে যাচ্ছি। চিন্তা করে দেখো, রফিকুল আলমের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সেটাই তো সবচেয়ে বড় সম্মান।'

'ভদ্রলোক কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে শারীরিকভাবে এভাবে কষ্ট দেবার কোন অধিকারই আমাদের নেই।'

'কায়সার, সারারাত ঘুমাওনি তো, তাই মাথা গরম হয়েছে। যাও, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি এখানে আছি।' মনিটর আর কী-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হাসান। অসহায়ের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কায়সার, তারপর পোশাক পালটাবার জন্যে লকারের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরপরই রফিকুল আলমের ভাইটাল সাইন পরীক্ষা করে দেখছে হাসান। অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। চামড়ার লালচে গোল দাগগুলো এখন ঘায়ের মত দেখাচ্ছে, নিচে পুঁজের চিহ্ন।

'আহ্...' ককিয়ে উঠলেন রফিকুল আলম।

'এই তো ঘুম ভেঙেছে, কেমন আছেন, বলুন।' দ্রুত এগিয়ে গেল হাসান বিছানার কাছে।

'ঘুম...কেন আমার ঘুম ভাঙালে...বাবা...আমি যে আর বাঁচতে চাই না...উঃ! বড় কষ্ট...' দুর্বল হাতে নাকের টিউব সরাবার চেষ্টা করলেন।

তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল হাসান। সমবেদনার হাত রাখল কপালে। 'অবুঝ হবেন না, আলম সাহেব। আমি জানি পেশায় আপনি একজন

শিক্ষক, আজীবন ছাত্র মানুষ করেছেন। নিজের মৃতদেহ দান করে গেছেন বিজ্ঞানের সেবায়, তাতেই বোঝা যায় কতবড় একজন অসাধারণ মানুষ আপনি। আলম সাহেব, বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আপনার নাম লেখা থাকবে। চিন্তা করে দেখুন, কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার সেটা।'

'সৌভাগ্য···আমার না আপনার?' অসহ্য যন্ত্রণায় ঠোঁট বাঁকালেন রফিকুল আলম। 'আপনি আপনার নিজের নাম নিয়েই বেশী চিন্তিত, তাই না?' কাশির দমকে বেঁকে গেল শীর্ণ দেহটা, একগাদা তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে।

সন্ধের আগেই ফিরে এল কায়সার। তার ঠিক চার ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর দ্বিতীয়বারের মত মৃত্যুবরণ করলেন রফিকুল আলম। দ্রুতহাতে মৃতদেহটা রিজুভিনেশন চেম্বারে তুলে ফেলল হাসান।

অবাক হয়ে গেল কায়সার, 'কি করছেন, হাসান ভাই?'

দ্রুতহাতে যন্ত্রপাতি ঠিক করতে করতে হাসান জবাব দিল, 'আবার চেষ্টা করে দেখি, যদি আর চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা যায়!'

ঠিক আধ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল হাসান। রফিকুল আলম আর বেঁচে উঠলেন না। পুরো সময়টা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কায়সার।

আরও ঘণ্টা চারেক পরে ক্লান্ত হাসান বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলো। ল্যাবের ঠিক সামনেই ওর টয়োটা স্প্রিনটার পার্ক করা। সারাদিনে একটা স্যান্ডউইচ ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি, ভীষণ খিদে পেয়েছে। মিলি নিশ্চয়ই এত রাত পর্যন্ত জেগে নেই। ফ্রিজে হয়তো খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যাবে, চিন্তা করতে করতেই দরজার লকে চাবি ঢোকাল হাসান। পরমুহূর্তেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কানের পেছনে শীতল ধাতব স্পর্শ।

'ওয়ালেটটা দ্যান···তেড়িবেড়ি করলে খুলি ফুটা হইয়া যাইব!' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল হাইজ্যাকারের বয়স বেশি নয়।

দ্রুতহাতে পকেট হাতড়াতে লাগল হাসান। 'এই যে

দিচ্ছি...প্লিজ...কোন গোলমাল করার দরকার নেই...' মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে সে।

'এইটা তো ডাক্তারখানা, মরফিন নাই? কই, আপনের ব্রিফকেস কই? কোনহানে রাখছেন?' গাড়ির ভেতরে উঁকি দিল ছেলেটা, হাতের পিস্তল তখনও হাসানের মাথার পেছনে ঠেকানো।

পাশ ফিরল হাসান, ছেলেটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে। খুব বেশি হলে বছর পঁচিশেক, জিন্সের প্যান্ট আর খয়েরী রঙের সোয়েটার পরনে উস্কখুস্ক চুল আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল, এরা পেয়েছেটা কি? মগের মুল্লুক? এদের ভয়ে কি সন্ধের পর সবাইকে বাড়িতে বন্দী হয়ে বসে থাকতে হবে?

হাসান নড়ে উঠতেই চমকে পিছু হটল ছেলেটা। ওর হাতের পিস্তলটা লক্ষ্য করে লাফ দিল হাসান, জানে ওর অর্ধেক সাইজের তালপাতার সেপাই ছেলেটাকে বাগে আনা কঠিন কোন ব্যাপার না।

নির্দ্বিধায় গুলি চালাল হাইজ্যাকার ছেলেটা। বুকে হাত চেপে মাটিতে বসে পড়ল হাসান, অবাক হয়ে চেয়ে আছে আততায়ীর দিকে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না সত্যিই গুলি চালিয়েছে। দিশেহারার মত এদিক-ওদিক তাকাল ছেলেটা, তারপর এক ছুটে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

গুলির শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠল কায়সার। ছুটে বেরিয়ে এল ল্যাবের বাইরে। স্ট্রীট লাইটের ম্লান আলোয় হাসানের গাড়িটা দেখতে পেল, কিন্তু হাসানকে দেখা যাচ্ছে না। 'হাসান ভাই!' ভীত কণ্ঠে ডাকল কায়সার, কোন উত্তর এল না। একটু এগিয়ে আসতেই গাড়ির আড়ালে পড়ে থাকা হাসানের শরীরটা দেখতে পেল সে। দৌড়ে এসে কোলে তুলে নিল হাসানের মাথাটা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুকের কাছটা। কায়সারের কোলে মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হাসান।

ছয়

আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল হাসান, চোখ মেলে চাইল। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে কায়সার, কোঁকড়া চুলগুলো উস্কখুস্ক। চমশার আড়ালে ক্লান্ত চোখজোড়ায় উদ্বেগ আর ভয়।

'এখন কেমন লাগছে, হাসান ভাই?'

মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে বুকের কাছটা স্পর্শ করতে গেল হাসান, 'আমি···গুলিটা···খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে?'

'বুলেটটা বের করে ফেলেছি, টিস্যু ড্যামেজ খুব একটা হয়নি। সবই মেরামত করা গেছে। হাসান ভাই,' একটু ইতস্তত করল কায়সার, 'ঠিক দু'ঘণ্টা দশ মিনিট আগে মারা গেছেন আপনি। সার্জারিতেই যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়ে এনেছি আপনাকে।'

হাসানের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনল। এতক্ষণে টের পেল, ও শুয়ে আছে রিজুভিনেশন চেম্বারের ভেতর। বাঁ হাতে বুকের ব্যানডেজটা স্পর্শ করল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'কেন আমাকে বাঁচালে, কায়সার? আর একটা দিনের জন্যে বেঁচে থেকেই বা কি হবে? উঃ···আমি আর ভাবতে পারছি না!'

অনেক কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখল কায়সার, এক হাতে জড়িয়ে ধরল হাসানের ডান হাতটা। 'এছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না, হাসান ভাই। আপনি মরে যাচ্ছেন, আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তা ছাড়া বলা যায় না, একদিনের বেশিও তো হতে পারে। আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।'

'সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই, কায়সার। আমরা দু'জনই জানি ঠিক কতক্ষণ আমার আয়ু আছে।' নিদারুণ হতাশায় চোখ বুজল হাসান।

হাসানের গাড়িটা পড়ে রইল পর্চে, কায়সার ওর গাড়িতে করে

হাসানকে বাড়ি পৌঁছে দিল। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ছোট্ট একতলা বাড়িটাকে কেমন শান্ত আর পবিত্র দেখাচ্ছে। ওই বাড়ির সুন্দরী মহিলা আর দেবশিশুর মত মেয়েটি কি জানে ওদের জীবনে কত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!

গাড়ির দরজা খুলে নামতে গিয়েও ইতস্তত করল হাসান। স্টিয়ারিং ছেড়ে সোজা হয়ে বসল কায়সার, 'দাঁড়ান, আমি আসছি।'

'না না, সাহায্য লাগবে না। কিন্তু কি জানো, ওই শুয়োরের বাচ্চার চেহারাটা কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না।' রাগে মুঠি পাকাল হাসান।

'কার কথা বলছেন?' অবাক হলো কায়সার।

'ওই হারামজাদাটা···মানে আমাকে যে খুন করেছে।'

'ও।' একটু চুপ করে থেকে কায়সার বলল, 'কিন্তু ভাবীকে এখন কি বলবেন? কিছু চিন্তা করেছেন?'

'জানি না! আমি কিচ্ছু জানি না!' রুদ্ধ আক্রোশে ড্যাশবোর্ডে একটা ঘুঁষি মারল হাসান। 'মিলিকে আমি কিভাবে বলব, আগামীকাল তুমি বিধবা হবে, আমার মেয়েটা পিতৃহারা হবে···না, কিছুতেই ওদেরকে কিছু জানানো যাবে না। কায়সার, তুমি ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

'ঠিক আছে,' মাথা নাড়ল কায়সার। 'আমি দুপুরের দিকে ফোন করব। গাড়িটা নিয়ে আসছি এক্ষুনি, চাবি রেখে যাব চিঠির বাক্সে।'

'ধন্যবাদ, কায়সার,' প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চাপার চেষ্টা করল হাসান, 'সবকিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছ। আর কিছু না হোক, বউ আর মেয়েটাকে আর একটা দিনের জন্যে কাছে পেয়েছি, তাই বা কম কি!'

কায়সার চলে গেল গাড়ি নিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লক্ খুলে বাড়িতে ঢুকল হাসান। বেডরুমে বাতি জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে মিলি। লেপের নিচ থেকে শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে। বহুকাল পরে তৃষিতের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল হাসান। কি নিষ্পাপ দেখাচ্ছে ওকে। দশ বছরেও সতেজ মুখটায় একটুও ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। অথচ কি আশ্চর্য, বোকার মত এসবকিছু এতদিন ভুলে ছিল সে। একটা দিন,

মাত্র একটা দিন! বছরের পর বছর ধরে যে ভুলের বোঝা জমেছে, মাত্র একটা দিনে সব কিছু শুধরে নেয়া কি সম্ভব?

বাতি নিভিয়ে পোশাক না বদলেই শুয়ে পড়ল হাসান। নড়েচড়ে উঠল মিলি, 'কখন এসেছ? ক'টা বাজে...'

'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রায় ভোর হয়ে এল।' আবার ঘুমে তলিয়ে গেল মিলি। এক হাতে ওকে কাছে টেনে নিল হাসান, আদুরে বেড়ালের মত গুটিসুটি মেরে বুকের সঙ্গে মিশে গেল সে। কি নিশ্চিন্ত গভীর ঘুম! দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাসান। মিলি যদি জানত আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ওর পরিচিত পৃথিবীটা তছনছ হয়ে যাবে!

হাতে মাত্র একটা দিন! এই একটা দিন নিয়ে কি করবে হাসান?

সাত

ভোরে ঘুম ভেঙে মুখ হাত ধুয়ে কিচেনে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল মিলি। ফ্রাইং প্যানে ডিম ভাজছে হাসান, অন্য চুলোয় চায়ের পানি বসিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে কোনদিন রান্নাঘরে দেখবে, মিলি কোনদিন মনে হয় তা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

'ভাবলাম ব্রেকফাস্টটা আজ আমিই বানাই,' লাজুক হাসল হাসান। 'আজ তোমার রেস্ট।'

'কিন্তু অত রাতে ফিরলে, এখন আবার এই সাতসকালে উঠে হাঙ্গামা শুরু করেছ। আয়নায় একবার দ্যাখো চেহারার অবস্থাটা। একটু না ঘুমালে যে শরীর খারাপ করবে।'

'আমার শরীর একদম ঠিক আছে,' ভাজা ডিমের রাশি প্লেটে তুলে ডাইনিং রুমের দিকে এগুল হাসান। 'দু'একরাত ঘুম না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আজ আমার ছুটি। সারাদিন আমরা একসঙ্গে থাকব।'

'কি হয়েছে তোমার বলো তো?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল মিলি, অবাক হয়ে দেখছে ওর কাজকর্ম। 'তুমি না বললে কি একটা

সাংঘাতিক এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কাজ করছ, হঠাৎ এর মধ্যে ছুটি নিচ্ছ!'

'কায়সার আছে, ওই দেখাশুনা করবে।' একটু কি রুক্ষ শোনাল হাসানের কণ্ঠস্বর? মিলির চোখে চোখ রাখল, নরম শান্ত গলায় বলল, 'আজকের দিনটা আমি তোমাদের সঙ্গে কাটাতে চাই, ব্যাপারটা কি খুব বেশি আজগুবি শোনাচ্ছে?'

'যাহ, কি যে বলো! কিন্তু তোমার তো কিচ্ছু ঠিক নেই, হঠাৎ করে কিছু একটা মনে পড়ে যাবে আর তক্ষুনি ছুটবে ল্যাবের দিকে।' মিলির কণ্ঠে একই সঙ্গে চাপা আনন্দ আর সংশয়।

একহাতে কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে মুখ গুঁজল হাসান, বিড়বিড় করে বলল, 'কারও সাধ্য নেই আজ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়!'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। মিলি চিন্তা করার চেষ্টা করছে হাসান শেষ কবে ওকে এভাবে আদর করেছে। ওদিকে টুকটুক স্কুলের ড্রেস পরে ঘুমঘুম চোখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। লজ্জা পেয়ে মিলিকে ছেড়ে দিল হাসান, ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিল মেয়েকে। ফুলো ফুলো গাল দুটোয় চকাস চকাস শব্দ তুলে চুমু খেল। 'কি রে বেটি, কোথায় যাবি আজ, বল্। চিড়িয়াখানা না শিশু পার্ক?'

'বা রে, ও তো এখন স্কুলে যাবে,' দুর্বল কণ্ঠে বাধা দেবার চেষ্টা করল মিলি।

'না, আজ কোন স্কুল নেই। আজ আমাদের সবার ছুটি, তাই না?' মেয়ের উদ্দেশ্যে চোখ টিপল হাসান।

'ঠিক ঠিক ঠিক!' খুশিতে নেচে উঠল টুকটুক। অনুনয়ের ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তাকাল। 'একদিন স্কুলে না গেলে কি হয়, আম্মি?'

'ঠিক আছে। যেতে হবে না স্কুলে,' হাসি চাপল মিলি। প্লেটে নাশতা বাড়তে শুরু করল।

টোস্টারে পাউরুটি ঢুকিয়ে দিল হাসান, গুনগুন করে কি একটা সুর ভাঁজছে। মা-মেয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল, সেখানে চাপা কৌতুক। অন্যদিন টুকটুককে নাশতা করানো একটা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, আর আজ সে গপাগপ খেয়ে নিচ্ছে। 'আমরা কোথায় যাব, বাপি?'

'যেখানে তোমার খুশি, মা,' চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে

উত্তর দিল হাসান। 'আজকের দিনটা শুধু আমাদের তিনজনের,' শেষ বাক্যটা বলল মিলির চোখে চোখ রেখে।

ঝটপট রেডি হয়ে নিল মিলি। সর্ষে রঙের সিল্কের শাড়িতে কি মোহময়ী দেখাচ্ছে ওকে! ঘাড়ের নিচে ছড়িয়ে পড়েছে ভারী চুলের বোঝা। চোখে কাজল, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। বহুদিন পর আজ সাজগোজ করেছে মিলি, টুকটুক পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখছে।

অনেক বেলা পর্যন্ত চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াল ওরা। টুকটুক তো হাঁটছে না, প্রায় লাফাচ্ছে। ছুটোছুটি করছে এদিক-ওদিক। অনর্গল প্রশ্ন করে যাচ্ছে, মন দিয়ে সাধ্যমত সেগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করছে হাসান। অনাবিল আনন্দে ভাসছে মিলি, টুকটুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। ওদের হাসিমুখ দেখে মাঝে মাঝেই গোপনে দীর্ঘশ্বাস চাপছে হাসান।

মিরপুর রোডের ওপর একটা স্ন্যাকবারে ঢুকল ওরা। মিলির ইচ্ছে ছিল চাইনিজ খাবে, কিন্তু টুকটুক আবদার ধরেছে ওর বিফবার্গার চাই-ই চাই। বিশাল কাঁচের উইন্ডো ঘেঁষে একটা টেবিলে বসল ওরা তিন জন। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে গেল।

ঢকঢক করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল হাসান। মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছে মিলি, একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তোমাকে কিন্তু খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খেয়ে নিয়ে চলো সোজা বাড়ি ফিরে যাই। রাতে তোমার ঘুম হয়নি।'

'আরে নাহ্! ওকে পাত্তাই দিল না হাসান। ভাগ্যিস ফুলস্লিভ শার্টের নিচে মিলি ওর শরীরটা দেখতে পাচ্ছে না। দুই হাতের পিঠে লালচে ঘা ফুটে উঠতে শুরু করেছে, সারা গায়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি। কড়ে আঙুলে কানের পিছনটা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে, জানো! কখনও তো সময় পাই না তোমাদেরকে নিয়ে বের হবার। তা টুকটুকি সোনা, এরপরে আমরা কোথায় যাব, বলো তো?'

'শিশু পার্ক! শিশুপার্ক!' বেণী দুলিয়ে কলকল করে উঠল টুকটুক।

'কিন্তু ব্যাপার কি, বলো তো?' হাসিমুখে জানতে চাইল মিলি, 'সকাল থেকেই তোমাকে একদম অন্যরকম মনে হচ্ছে। কি হয়েছে

সত্যি করে বলো তো? উল্টোপাল্টা কিছু করে বসোনি তো?' আড়চোখে টুকটুকের দিকে তাকাল সে।

হো-হো করে হেসে উঠল হাসান। 'কি যে বলো! কেন, আমার বুঝি কোনরকম শখ থাকতে পারে না!'

'গত দশ বছরে তো কোন শখ দেখিনি। আজ সকাল থেকেই তোমাকে কেমন যেন অচেনা মানুষের মত মনে হচ্ছে।' মিলির চোখের তারায় বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া দ্যুতি।

পরম আদরে ওর চুলে হাত রাখল হাসান। 'তাহলে তো প্রেমটা নতুন করে জমবে, কি বলো?'

'মেয়েটার সামনে কখন কি বলো হুঁশ থাকে না!' কপট রাগে চোখ রাঙাল মিলি। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিছু না বুঝেই হাসিতে যোগ দিল টুকটুক।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শিশুপার্কে চলে এল ওরা। শীতকাল বলে রোদের আঁচটা একটুও গায়ে লাগছে না। পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল আকাশ। ভারি সুন্দর একটা দিন। এতটা সুন্দর না হলেই যেন ভাল হত, ভাবল হাসান। মেয়ের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছে ঠিকই, তবুও বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কৃপণের মত একটু একটু করে খরচ করা সত্ত্বেও শেষ হয়ে আসছে মূল্যবান দিনটা।

চটপটি খাচ্ছিল ওরা। টুকটুকের হাতে ঠাণ্ডা কোকের বোতল। হঠাৎ চমকে উঠল মিলি, প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'তোমার মুখে রক্ত! কি হয়েছে...'

ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারাটা দ্রুত ন্যাপকিনে মুছে নিল হাসান। 'আরে ও কিছু না। মনে হয় ওষুধের রিঅ্যাকশন।'

'ওষুধ? কিসের ওষুধ?'

'গতকাল জ্বর-জ্বর করছিল বলে নতুন একটা বিদেশী ওষুধ খেয়েছিলাম। ও কিছু না।' ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল হাসান। কিন্তু মিলিকে এত সহজে ভোলানো গেল না। হাসি মুছে গেছে ওর মুখ থেকে। প্রায় জোর করে বাড়ি ফিরে গেল।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে টুকটুক। ফিরেই ঘুমিয়ে

পড়ল। মেয়েকে বুকে নিয়ে শুলো হাসান। মিলি পাশে আধশোয়া হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'রাতে কি খাবে, বলো তো?' জানতে চাইল মিলি।

'কেন, বুয়া রান্না করে রেখে যায়নি?'

'তা তো গেছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম তোমার যদি স্পেশাল কিছু খেতে ইচ্ছে করে...'

'কষ্ট করার কোন দরকার নেই, মিলি। যা আছে তাতেই হবে। তাছাড়া একটুও খিদে নেই।'

'শরীর খারাপ লাগছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল মিলি, বুকে হাত বুলাতে গিয়েই চমকে উঠল। ব্যানডেজে ঠেকেছে আঙুলের ডগা। তাড়াতাড়ি শার্টের বোতাম খুলেই বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। 'কি...কি হয়েছে এখানে...'

তাড়াতাড়ি উঠে বসল হাসান। আটকে দিল বোতাম দুটো। 'ভয়ের কিছু নেই, মিলি। দু'তিনদিন আগে ল্যাবে কাজ করার সময় অ্যাসিড পড়েছিল। কায়সার ব্যানডেজ করে দিয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি।'

বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না, অবাক হয়ে চেয়ে আছে মিলি। অস্ফুটে বলল, 'হাসান, তোমার কানের পেছনে একটা ঘা...'

চমকে উঠল হাসান, অজান্তেই ডান হাতটা চলে গেল কানের পেছনে। চেষ্টা করে একটু হাসির ভঙ্গি করল। 'ওই যে বললাম, অ্যাসিড। দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না। রাতে খাবার পরে একবার ল্যাবে যাব। কায়সার একা একা আছে, একটু দেখে আসব।'

'আজ না গেলে হয় না? তোমার শরীরটা ভাল না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাসান। 'উপায় নেই, যেতেই হবে। তোমাকে তো বলেছি, জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কাজ করছি আমরা।'

বিষণ্ন চোখে চেয়ে রইল মিলি, কোন কথা বলল না।

'কি, কথা বলছ না যে?' ওকে কাছে টানল হাসান।

'আমার শুধু মনে হচ্ছে তুমি কোন কিছু লুকাচ্ছ, সবকিছু খুলে বলছ না। সত্যি করে বলো তো, কোন বিপদ হয়নি তো?'

'বোকা মেয়ে!' মিলির কপালে চুমু খেল হাসান। 'বলছি তো, কিচ্ছু হয়নি। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ফিরব আমি। ল্যাবের নম্বর তো তুমি জানোই। সন্দেহ হলে কায়সারের সঙ্গে কথা বলো।'

'না রে, সন্দেহ করব কেন?' অভিমান ভরে বলল মিলি। 'তোমার শরীর খারাপ দেখেই শুধু চিন্তা করছি।'

ওর চুলের অরণ্যে মুখ গুঁজে বুক ভরে শ্বাস নিল হাসান। গভীর আদরে বলল, 'তোমাকে কত ভালবাসি তা কি তুমি জানো, মেয়ে?'

হেসে ফেলল মিলি, 'খুব যে প্রেম উথলে উঠেছে দেখি!'

'ঠাট্টা নয়, মিলি। তুমি আর টুকটুক আমার কতখানি, তা কি তোমরা জানো?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আদরে আদরে মিলিকে অস্থির করে তুলল।

ফোন তুলে ল্যাবের নম্বরে ডায়াল করল হাসান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কায়সারের গলা শোনা গেল, 'হ্যালো!'

'আমি হাসান বলছি।'

'আরে হাসান ভাই,' উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে কায়সার, 'আপনাকে সেই দুপুর থেকে ফোন করছি, কেউ ধরছে না।'

'আমরা কেউ বাসায় ছিলাম না। এদেরকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এত রাতে ল্যাবে কি করছ, বাড়ি যাওনি?'

'না। বাড়ি যাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। হাসান ভাই, আপনি কি একটু ল্যাবে আসবেন? কয়েকটা টেস্ট রান করতে চাই।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ফোন করেছি। আমি আর আধঘণ্টার মধ্যেই রওনা হব।'

'আর হ্যাঁ, গাড়ির চাবিটা চিঠির বাক্সে পেয়েছিলেন তো? গাড়িটা ঠিকঠাক ছিল, কোন অসুবিধা হয়নি?'

'কিচ্ছু না। সব ঠিক ছিল। কত কষ্ট করে আবার গাড়িটা রেখে গেছ! তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, ভাই। মনে কিছু রেখো না। এ জীবনে তোমার মত বন্ধু আর দ্বিতীয়টি পেলাম না, এটাই যা দুঃখ রয়ে গেল।'

'আরে রাখেন তো এসব ইমোশনাল কথা!' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কায়সার, 'এখন তাড়াতাড়ি ল্যাবে চলে আসেন। আপনাকে কয়েকটা

জিনিস দেখাতে চাই।'

'তাড়াতাড়ি তো করতেই হবে, কায়সার। সময়ের বড় অভাব!'

ঠিক পাঁচশ মিনিটের মাথায় ল্যাবের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল হাসান। মিলির সন্দিহান চোখের সামনে থেকে সরে আসতে পেরে স্বস্তি হলো। ইতিমধ্যে মুখের চামড়াতেও লালচে ঘা দেখা দিয়েছে। গোছা গোছা চুল উঠে আসছে মাথায় হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে। এ অবস্থায় মিলির সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল।

ট্যাঙ্কে যথেষ্ট গ্যাস নেই। কার্ছেপিঠে কোথায় পেট্রোলপাম্প আছে মনে করার চেষ্টা করল। এতদিনের পরিচিত রাস্তা, তারপরেও কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। কেন যেন কোনদিকে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারছে না। সারা শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি, চামড়ার নিচে বিরক্তিকর চুলকানি। প্রচণ্ড মাথাব্যথা।

অবশেষে একটা পেট্রোলপাম্প দেখা গেল। ভাগ্য ভাল, ভীড় নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার কথা চিন্তা করলেই মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্ত এখন ওর কাছে অমূল্য। ব্যবহার করার সময় পাবে কিনা জানে না, তবুও পুরো ট্যাঙ্ক ভর্তি করে গ্যাস নিল হাসান।

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে দাম মিটিয়ে দিল। খুচরো ভাঙতির জন্যে অপেক্ষা করছে, হঠাৎ করেই প্রচণ্ড চমকে উঠল। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্যে পৃথিবীটা শব্দহীন হয়ে গেল।

পেট্রোলপাম্পের ঠিক পাশেই একটা চায়ের দোকান। সামনে পাতা বেঞ্চে আরও দুই ছোকরার সঙ্গে বসে গুলতানী মারছে সেই হাইজ্যাকার! হাসানের হত্যাকারী! পরনে সেই একই জিন্‌স্ আর খয়েরী সোয়েটার, এলোমেলো চুল আর না-কামানো দাড়ি। স্ট্রীটলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, চিনতে একটুও ভুল হয়নি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ড্যাশবোর্ড হাতড়াল হাসান। হ্যাঁ, আছে। চামড়ার বাক্সটা জায়গামতই আছে। হাত কাঁপল না একটুও, বাক্স খুলে

আলগোছে তুলে নিল হাসান চকচকে আগ্নেয়াস্ত্রটা। নিরীহদর্শন অথচ কি প্রচণ্ড শক্তির উৎস এই ছোট্ট যন্ত্রটা।

ধীর পায়ে এগুলো হাসান। ডান হাতের তালুতে শক্ত করে ধরে আছে বেরেটা।

ছোকরার ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ছোকরা, ভাঙা গলায় বলল, 'ক্যাডা? কি চাই?'

'চিনতে পারছ না? আমাকেই তো গুলি করে মেরে রেখে গিয়েছিলে, মনে নেই?' হাসানের কণ্ঠে নির্ভেজাল বিদ্রূপ।

সঙ্গী দু'জন ততক্ষণে দেখে ফেলেছে হাসানের হাতের বেরেটাটা, মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল তারা। হাঁ হয়ে গেল ছোকরা। উঠে দাঁড়াতে গেল।

গুনে গুনে ঠিক তিনবার গুলি করল হাসান। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ছোকরা। দু'বার খিঁচুনি তুলে একসময় নিথর হয়ে গেল। আশ্চর্য, মরার সময় একটুও শব্দ করেনি সে।

বুকের মধ্যে অনবরত জ্বলতে থাকা প্রতিশোধের আগুনটা ঝট্ করে নিবে গেল। দারুণ ক্লান্ত বোধ করল হাসান। কে যেন কাঁধ থেকে দু'মন ওজনের একটা বোঝা সরিয়ে নিয়েছে। এক পা এগিয়ে গিয়ে মন দিয়ে ওর খুনীকে দেখল হাসান। নিষ্প্রাণ খোলা দু'চোখে চোখ রেখে ফিসফিস করে বলল, 'এই তো, আমরা দু'জনেই এখন মরে গেলাম!'

ল্যাবের দরজা খুলে ঢুকতেই হৈহৈ করে দৌড়ে এল কায়সার, 'হাসান ভাই, আপনাকে দেখে কি যে ভাল লাগছে!'

'কেন, ভাবছিলে বুঝি এতক্ষণ পর্যন্ত টিকব না!' ম্লান হাসল হাসান।

'আরে না,' জোর করে ধরে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল কায়সার। 'আপনি যাবার পর সবগুলো টেস্ট রেজাল্ট এতক্ষণ ধরে বসে বসে পরীক্ষা করলাম। আরও একবার টেস্টগুলো রান করা দরকার নিশ্চিত হবার জন্যে। কিন্তু হাসান ভাই,' উত্তেজনায় কাঁপছে কায়সারের কণ্ঠস্বর, 'আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, আপনি মারা

যাচ্ছেন না!'

ভাবলেশহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হাসান। তারপর শার্টের হাতা গুটিয়ে রক্তাক্ত হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল। 'তাহলে এগুলো কি? দ্যাখো, আমার সারা শরীরে কাঁচা ঘা।'

'এগুলো ধ্বংসের নয়, পুনর্গঠনের চিহ্ন। হাসান ভাই, আপনার পুরো শরীর নতুন করে আবার গড়ে উঠছে। সারাদিন ধরে আমি এই আউটপুটগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, আপনার সম্পূর্ণ ইন্টার্নাল সিস্টেম নতুন করে ডেভেলপ করছে। বিশ্বাস না হলে এই দেখুন,' একগাদা প্রিন্টআউট বাড়িয়ে ধরল কায়সার।

বিমূঢ়ের মত চেয়ে আছে হাসান। 'কি বলছ, কায়সার! আমাদের চোখের সামনে রফিকুল আলম ধুঁকে ধুঁকে মারা গেলেন!'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মৃত্যুর পরপর রফিকুল আলমের মৃতদেহ ফ্রোজেন করে রাখা হয়েছিল। আপনার বেলায় তা হয়নি।'

'কিন্তু অন্যান্য জীবজন্তুর বেলায় কয়েকবারই আমরা আন-ফ্রোজেন অবস্থাতেই এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তখন তো এমন হয়নি!'

'কারণ এই প্রথমবারের মত আমরা মানবদেহের উপর এক্সপেরিমেন্টটা করতে পেরেছি, নিশ্চয়ই সেটাই একটা বড় ফ্যাকটর। উঃ! আমি ভাবতেই পারছি না, একেই বোধহয় বলে শাপে বর!'

আধঘণ্টা ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওরা দু'জনই নিশ্চিত হলো, হাসান পুরোপুরি সুস্থ। মৃত্যুর কোন চিহ্নই নেই। কোনরকম সেল ড্যামেজ দেখা যাচ্ছে না। অর্গ্যান ড্যামেজ প্রায় অনুপস্থিত। চেক্-আপ টেবিল থেকে নেমে এসে কায়সারকে জড়িয়ে ধরল হাসান।

রাত প্রায় দুটো বাজল বাড়ি ফিরতে। মিলি জেগে ছিল, দরজা খুলল সে-ই। ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিয়ে একটা পাক খেল হাসান। হতচকিত মিলি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কি করছ! পড়ে যাব তো!'

হাসতে হাসতে ওকে সোফায় শুইয়ে দিল হাসান। উপুড় হয়ে ঝুঁকল ওর মুখের ওপর, 'কি যে আনন্দ হচ্ছে, জানো, মিলি! আমার ধারণা ছিল আমি মারা যাচ্ছি।'

'বলো কি!' ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল মিলি।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। ভয়ের কিচ্ছু নেই। এখন জেনে গেছি, আমি আর মরছি না। দেখো, আমি এখন থেকে একদম বদলে যাব। তোমাদের আর এক মুহূর্তের জন্যেও কোনদিন দুঃখ পেতে দেব না...বিশ্বাস করো...'

কলিং বেলটা বেজে উঠতেই চমকে উঠল মিলি। এতরাতে আবার কে এল? হাসান উঠে দরজা খুলতে যেতেই আর্তনাদ করে উঠল, 'খুলো না, হাসান, খুলো না! আমার ভয় করছে!'

'দূর বোকা,' আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল হাসান, 'আমি আছি, ভয়ের কি আছে? কায়সার হতে পারে, হয়তো কিছু ফেলে এসেছি ল্যাবে।'

দরজা খুলতেই দেখা গেল, কায়সার নয়, খাকি ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি ডা. হাসানুল করিম?'

শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা ঢেউ। গলা দিয়ে শব্দ বের হলো না, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হাসান।

'আপনার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে। কয়েক ঘণ্টা আগে হিরু নামের এক লোককে গুলি করে হত্যা করেছেন আপনি।'

'আপনারা ভুল করছেন,' কোনমতে বলল হাসান, 'ওই লোকটাই আমাকে খুন করেছিল...মানে...শুনতে অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে জানি...'

এতক্ষণে হুঁশ ফিরে পেয়ে দৌড়ে এসে হাসানকে আড়াল করে দাঁড়াল মিলি। 'সারাদিন গতরাত আমার স্বামী আমার সঙ্গেই ছিলেন, আপনারা ভুল করছেন। হাসান এ কাজ কখনোই করেনি।'

'কোন লাভ নেই,' কঠিন দেখাচ্ছে অফিসারের মুখের রেখাগুলো। 'আপনার সাক্ষ্য কোর্টে টিকবে না। ডাক্তার সাহেব তাঁর মানিব্যাগ ফেলে এসেছেন ঘটনাস্থলে। এছাড়া সাতজন লোকের চোখের সামনে ঘটেছে পুরো ঘটনা।'

দিশেহারার মত এদিক-ওদিক তাকাল হাসান। 'আপনারা বুঝতে পারছেন না...ওই লোকটা খুনী! এই যে দেখুন, আমাকে গুলি করেছে...' বলতে বলতে শার্টের বোতাম খুলে লম্বা করে সাঁটা ব্যানডেজটা দেখাল। টেনে খুলে ফেলল ব্যানডেজ। পরমুহূর্তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ব্যানডেজের নিচে বুকের চামড়া মরুভূমির

মত মসৃণ আর পরিচ্ছন্ন। অপারেশনের দাগটা বেমালুম মিলিয়ে গেছে! বোকার মত সেদিকে চেয়ে রইল হাসান, চোখে নির্ভেজাল ভয় আর অবিশ্বাস!

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মিলি। কিন্তু কিছুই যেন হাসানকে স্পর্শ করছে না। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। পকেট থেকে হ্যাণ্ডকাফ বের করল অফিসার। সেদিকে চোখ পড়তেই নড়ে উঠল হাসান, না...আমি কোন অন্যায় করিনি। ওই খুনী গুণ্ডাটাকে মারা কোন অপরাধ নয়...'

'আপনার যা বলার, তা কোর্টে বলবেন।' হ্যাণ্ডকাফ হাতে যমদূতের মত এগিয়ে এল অফিসার।

সুরলোক

এক

বেশ রাত হয়েছে। বাইরে দোকানপাটের শাটার বন্ধ হতে শুরু করেছে। জারুল আর ছাতিমের ছাতার নিচে জমাট বেঁধে এসেছে ঘন অন্ধকার। অবশ্য তাহ্‌মীদ এসব কিছু ভাবছে না। ওর সব মনোযোগ টেবিলের উপর রাখা রেডিও-ট্র্যানসিভারের দিকে, একাগ্র হয়ে শুনছে রেডিও-সিগন্যালের একঘেয়ে রহস্যময় গুঞ্জন। গভীর কুয়োর নিচে জলের প্রতিধ্বনির মত ভাঙতে ভাঙতে উঠছে শব্দটা। একবার কমছে, একবার বাড়ছে। একটানা। অধীর আগ্রহে শুনছে তাহ্‌মীদ। মহাশূন্যের কোনও অজানা কোণ থেকে ভেসে আসছে এই শব্দপ্রবাহ! অবিরত!

কার্জন হলের পিছনে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের যে নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে, মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রটা সেই বিল্ডিঙেরই শেষ প্রান্তে। তাহ্‌মীদ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। চশমা চোখে, হালকা-পাতলা মিষ্টি চেহারার ছেলেটিকে শিক্ষকরা ভালবাসেন। শুধু ভাল ছাত্র বলেই নয়, জানার জন্যে ওর আগ্রহ আর সিরিয়াসনেসের জন্যেও। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধের পর তাহ্‌মীদ ল্যাবে চলে আসে, যখন ওর বন্ধুরা চায়ের দোকানে আড্ডায় বসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুনতে থাকে রেডিও-সিগন্যালের একঘেয়ে চাপা শব্দ।

ল্যাবকোট গায়ে করিডর ধরে হেঁটে আসছিলেন ডক্টর দোহা। স্পেইস-ল্যাবের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন। তাহ্‌মীদ এখনও ল্যাবে বসে আছে! এগিয়ে গিয়ে ওর পিছনে দাঁড়ালেন ডক্টর দোহা, 'রাত কত হয়েছে তা মনে আছে, তাহ্‌মীদ?'

একটুও চমকাল না তাহ্‌মীদ। অস্ফুট স্বরে কোনমতে বলল, 'এই তো, স্যার···এখুনি চলে যাব!' ওর সব মনোযোগ সামনের মনিটরের ভঙ্গুর সবুজ রেখাটার দিকে, শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সেটা উঠছে আর

নামছে।

'তোমাকে প্রায়ই দেখি এখানে। কি করো তুমি একটু বলো তো?'

অনেক কষ্টে মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে ডক্টর দোহার দিকে তাকাল তাহ্‌মীদ। 'স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?'

একটু অবাক হলেন তিনি। 'এ তো ফাঁকা আওয়াজ। শোনার মত কি আছে?'

'না···মানে···ভাল্ করে শুনুন, স্যার। এরমধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে।'

'কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু আছে। আমি জানি এর কোন অর্থ আছে। এই যে, দেখুন, স্যার, আমি টেপ করে নিয়েছি, বাড়ি গিয়ে শুনব।' ডান হাতে ধরা ক্যাসেটটা উঁচু করে দেখাল তাহ্‌মীদ।

ভুরু কুঁচকে সস্নেহে প্রিয় ছাত্রের দিকে তাকালেন ডক্টর দোহা, 'আমাদের এই লিস্‌নিঙ পোস্টটা মাত্র এক বছর আগে বসানো হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু বছর আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা আউটার স্পেস থেকে পাঠানো কাল্পনিক সিগন্যাল শোনার চেষ্টা করছে। কেউ সার্থক হয়েছে বলে শুনিনি।'

'কিন্তু স্যার, এই শব্দটা অর্থহীন না। এর মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে···সেটাই ধরতে পারছি না।'

'কম্পিউটারে রান করেছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাহ্‌মীদ। 'জ্বী। প্যাটার্ন রিকগনিশন প্রোগ্রামে কিছু ধরা পড়ছে না। কিন্তু স্যার, বিশেষ কোনও দিক থেকেই তো আসছে শব্দটা! একদম অর্থহীন কি করে হবে?'

টেবিলে হেলান দিয়ে তাহ্‌মীদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন ডক্টর দোহা। 'অনেকেই তোমার মত এই ভুলটা করে। আসলে ওটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন অথবা অ্যাটমসফিয়ারিক বাউন্স–তোমার মনে হচ্ছে বহির্বিশ্ব থেকে পাঠানো মেসেজ। শুধু শুধু মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট কোরো না। গতকাল যে ডেটা দিয়েছিলাম, সেটা রান করেছ?'

অন্যমনস্কভাবে চেয়ারের পাশে রাখা ব্যাগ থেকে একতাড়া প্রিন্টআউট বের করে স্যারকে দিল তাহ্‌মীদ। হাত বাড়িয়ে রেডিওটা

বন্ধ করে দিলেন ডক্টর দোহা। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'এবার বাড়ি যাও, তাহ্‌মীদ। অনেক রাত হয়েছে।'

'স্যার, আর পাঁচটা মিনিট...'

'না। তুমি ভুলে গেছ, কিন্তু আমার মনে আছে। আগামীকাল সকাল আটটায় তোমার ক্লাস। বাড়ি গিয়ে এখন ঘুমাও। ইয়াংম্যান, শরীরের যত্ন নিতে হয়!' বেরিয়ে যাবার পথে ল্যাবের আলোটা নিভিয়ে দিলেন তিনি, মনে মনে বললেন, 'পাগল ছেলে একটা!'

একটু বেশী রাতে ঢাকার রাস্তায় হাঁটতে ভালই লাগে। কেমন নিঝুম আর রহস্যময় দেখায় ব্যস্ত শহরটাকে। যেন অন্য কোন জগৎ। পৃথিবীর বাইরের কোন বসতি। তখন কি ভীষণ ভাল লাগতে থাকে চারদিকটা! নীলক্ষেতের সরকারী কোয়ার্টারে থাকে তাহ্‌মীদরা, খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল পথটুকু। সবাই নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। বেল না দিয়ে আস্তে করে দরজায় টোকা দিল তাহ্‌মীদ। প্রায় মিনিট দশেক ধরে দরজা ধাক্কানোর পর কাজের ছেলেটা সদ্য ঘুমভাঙা চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলে দিল। বাড়ির সব আলো নেভানো। শুধু তরুর ঘরের বন্ধ দরজার নিচে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে তরু এখনও জেগে আছে। আবছা অন্ধকারে নিজের ঘরে ঢুকে সোজা পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল তাহ্‌মীদ। পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাল। এতরাতে জোরে ক্যাসেট প্লেয়ার বাজানো যাবে না। হেডফোনটা সেট করে নিল। তারপর চালিয়ে দিল ক্যাসেট। মিষ্টি আলোয় তন্ময় হয়ে বসে শুনতে লাগল তাহ্‌মীদ সেই রহস্যময় সুরহীন সঙ্গীত।

'কি রে, ভাইয়া, তুই ভাত খাবি না?' তরু যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি তাহ্‌মীদ। চমকে উঠে বলল, 'তুই এখনও ঘুমাসনি?'

'তোর জন্যেই তো বসেছিলাম। কেন যে এত দেরি করিস! আম্মা কিন্তু খুব রেগে আছে।' কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে চোখ পাকাল তরু। আবছা হলদে আলোয় রাত-জাগা ফুলো ফুলো চেহারায় ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে তাকে। পাতলা নাইটির উপরে একটা ওড়না জড়িয়ে পরেছে।

অন্য সময়ে এক ঢাল রেশমী চুল থাকে পিঠজুড়ে। এখন তা একটা শক্ত বিনুনিতে বাঁধা–রাতের শোবার প্রস্তুতি। তরু হলি ক্রসে পড়ছে ফার্স্ট ইয়ারে।

তাহ্‌মীদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোন কথাই যেন ওর কানে যায়নি। বিরক্ত হলো তরু। এগিয়ে এসে ওর কান থেকে হেডফোন সরিয়ে দিল, 'দিনরাত কি এত শুনিস বল তো, ভাইয়া?'

'অ্যাই, কি করছিস্?' বিব্রত হলো তাহ্‌মীদ।

'কথা বললে কানে যায় না' এতরাতে হেডফোন কানে কি এত হাবিজাবি শুনিস?'

'কি যে শুনি, তা কাউকে বোঝাতে পারছি না। অথচ আমি জানি, কি যেন একটা আছে...' যত্নের সঙ্গে হেডফোনটা টেবিলে রাখল তাহ্‌মীদ।

'আবোল তাবোল কি যে বকিস্, তা তুই-ই জানিস্! এখন যা, টেবিলে ভাত ঢাকা আছে, দয়া করে খেয়ে নে। নাহলে সকালে আম্মা তোর ভূত ছাড়িয়ে দেবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল তাহ্‌মীদ। আড়মোড়া ভাঙল। ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাইনিং স্পেসের উদ্দেশে। ওকে অনুসরণ করতে গিয়েও থেমে গেল তরু, ঘুরে তাকাল টেবিলে রাখা হেডফোনটার দিকে। পাগল ভাইটা কি শোনে এত দিনরাত? পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। চেয়ারে বসে হেডফোনটা পরল। সঙ্গে সঙ্গে আবেশে কেঁপে উঠল গোটা শরীরটা। নিজের আজান্তেই চোখ বুজে এল, চেয়ারে এলিয়ে পড়ল তরু। গোটা শরীর জুড়ে তীব্র ভাললাগার শিহরণ, রামধনুরঙা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে পুরো জগৎটা। ভেসে যেতে চাইল, ডুবে যেতে চাইল তরু নামের ছোট্ট মেয়েটা অপূর্ব সুরের সেই মূর্ছনায়।

দুই

সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় নাস্তার টেবিলে এসে বসলেন ডাক্তার সালাহ্

উদ্দীন। মেডিকেল কলেজের শিক্ষক তিনি, ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা অভ্যেস। গরম টোস্টে দাঁত বসিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'তাহ্‌মীদ কোথায়? ক্লাসে?'

ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে নিলুফার বললেন, 'হ্যাঁ···নাস্তা না খেয়েই চলে গেল। রাতে কখন ফিরেছে কি জানি! ছেলেটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলো তো!'

'হুঁ!' চুপচাপ নাস্তা শেষ করলেন সালাহ্‌ উদ্দীন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, দেখে আর একটু বেশী মনে হয় ভারী গড়নের কারণে। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুলের পরিমাণই বেশী। দু'চোখের মাঝে কপালে গভীর ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন, 'তরুকে দেখছি না?'

'ও-তো দেখলাম তাহ্‌মীদদের ঘরে। কি যেন শুনছে ক্যাসেটে! নাস্তা খেতে ডাকলাম, কই, এখনও তো এল না!' নিলুফারের সুন্দর মুখে স্পষ্ট বিরক্তির রেখা।

চায়ের কাপ হাতে তাহ্‌মীদের ঘরের দিকে রওনা হলেন সালাহ্‌ উদ্দীন। ভোরের নাস্তার ব্যাপারটা স্বাস্থ্যের জন্যে যে কত জরুরী, তা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝতেই চায় না। তরু তো সকালে চা-বিস্কুট ছাড়া আর কিচ্ছু খাবেই না। নাহ্‌, এসব মোটেই ভাল কথা নয়।

'তরু···তরু, মা···!' ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন সালাহ্‌ উদ্দীন। চেয়ারে পা তুলে এলিয়ে বসে আছে তরু, চেয়ারের পিঠে ঝুলছে ওর লম্বা বিনুনি। কানে হেডফোন। এই সাতসকালে কি গান শুনছে মেয়েটা? কাছে গিয়ে জোর গলায় ডাকতে আস্তে আস্তে চোখ খুলল তরু। বড় বড় পাপড়ি ঘেরা ভারী চোখের পাতায় ক্লান্তি, কেমন যেন ঘোর লাগা ঢুলুঢুলু দৃষ্টি। চোখের কোলে কালি।

'কিরে, রাতে ঘুমাসনি? শরীর খারাপ লাগছে?' মেয়ের কপালে হাত রেখে তাপ দেখলেন সালাহ্‌ উদ্দীন। নাহ্‌, চিন্তার কিছু নেই, স্বাভাবিক তাপমাত্রা। 'তোর মা নাস্তা নিয়ে বসে আছে, খেতে যাবি না?'

ঘোরলাগা চোখ দুটো যেন একটু চঞ্চল হলো, 'ক'টা বাজে, বাবা?'

'পৌনে আটটা বেজে গেছে।'

'আরে! আমার তো কলেজ আছে!' কান থেকে হেডফোন খুলে টেবিলে রাখল তরু। দ্রুতহাতে বের করে নিল ক্যাসেটটা। ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে। একটু অস্বস্তি নিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সালাহ্ উদ্দীন। মেয়েটার চোখে ও কিসের ঘোর?

অস্থির পায়ে করিডরে পায়চারি করছিল মিলি। কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে অনেকক্ষণ। তরুটা কেন যে এত দেরি করছে! ওরা দু'জন একসঙ্গে কলেজে যাওয়া-আসা করে সবসময়। আজ পর্যন্ত কখনও তরু এত দেরি করেনি। তাই অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও হচ্ছে। বাড়িতে কোন বিপদ হলো না তো! অধৈর্য হয়ে বইয়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্যানডেল পরতে গেল মিলি, আর অপেক্ষা করা যায় না। ঠিক তক্ষুনি সদর দরজায় বেল বাজল।

দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল তরু। ইস্ত্রী ছাড়া সাদা চিকেনের সালোয়ার-কামিজ পরনে, পায়ে কালো চপ্পল। এলোমেলো চুল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে চিরুনি বুলাবার সময় পায়নি।

'কি রে, এত দেরি করলি!' বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছিল মিলি, কিন্তু পিছন থেকে তরু ওর হাত টেনে ধরাতে থামতে বাধ্য হলো।

'দারুণ একটা জিনিস শোনাব তোকে! বাজি ধরে বলতে পারি কক্ষনো এমন কিছু শুনিস্নি এর আগে।' ঝট্ করে ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ওয়াকম্যান বের করে ফেলেছে তরু, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওটা নিয়ে।

'তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি? ক'টা বাজে খেয়াল আছে?' বিরক্ত হয়ে আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাল মিলি, দ্রুতপায়ে এগুল দরজার দিকে।

'আরে, যাচ্ছিস কোথায়? একটু দাঁড়া না...' বলতে বলতে ওয়াকম্যানের হেডফোনটা মিলির কানে পরিয়ে দিল তরু। অন করে দিল সুইচ।

সঙ্গে সঙ্গে মিলির সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল। তড়িতাহতের মত এলিয়ে পড়ল শরীরের সমস্ত মাংসপেশী। হাওয়ায় ভাসতে লাগল মিলি, অন্য কোন ভুবনে। পরিচিত পৃথিবীটা মিলিয়ে গেল কোথায়

যেন, চারপাশে শুধু ভালবাসা আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

'কি, বলিনি? বিশ্বাস হলো?' সুইচ টিপে ওয়াকম্যানটা অফ করে দিল তরু।

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে গেল মিলি, 'না না, বন্ধ করিস না! চালিয়ে দে, প্লিজ···'

'না, এখন না,' চকচক করছে তরুর আয়ত চোখজোড়া। 'চল্, আগে আমরা কলেজে যাই। সবাইকে শোনাতে হবে এই ক্যাসেট!'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন মিলির মা, ওদের দু'জনকে দেখে একটু অবাক হলেন, 'কি ব্যাপার, তোমরা এখনও কলেজে যাওনি?'

'এই তো, খালাম্মা, যাচ্ছি!' মিলির হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল তরু।

ওদিকে বিকেলে হন্তদন্ত পায়ে বাড়ি ফিরল তাহ্মীদ। সারাঘর তোলপাড় করে ফেলল ক্যাসেটের খোঁজে, কিন্তু কোথাও পেল না।

'সেই তখন থেকে দেখছি কি যেন খুঁজছিস, কি জিনিস বল্ তো?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন নিলুফার।

'এই···মানে···একটা ক্যাসেট। দেখেছ?' একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল তাহ্মীদ।

'কী জানি! কত ক্যাসেটই তো আছে ঘরে। কোনটা খুঁজছিস কেমন করে বলব?' সদ্য গোসল করে বেরিয়েছেন নিলুফার, গামছায় চুল মুছতে মুছতে বারান্দার দিকে হাঁটতে লাগলেন।

পিছু নিল তাহ্মীদ। 'তরু কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? কাল রাতে ও শুনছিল।'

'কি জানি বাপু!' গামছাটা তারে মেলে দিতে দিতে নিলুফার বললেন, 'সকালেও তো তোর ঘরে গান শুনছিল! তোরা যে কি··· ওই সাত সকালে কেউ গান শোনে!'

'তরু কখন ফিরবে, মা?'

'আজ তো কলেজের পরে ও পড়তে যাবে। ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে।'

দ্বিরুক্তি না করে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল তাহ্মীদ। রাস্তায়

এসে একটা রিকশা নিল। সপ্তায় তিনদিন ঢাকা কলেজের বিখ্যাত এক শিক্ষকের কাছে পড়তে যায় তরু, ধানমণ্ডীর সেই বাড়িটা তাহ্‌মীদ চেনে। গ্রুপে গ্রুপে ছাত্র-ছাত্রী পড়ান এই ভদ্রলোক, রমরমা ব্যবসা। অনেক ধরাধরি করে বিশজনের একটা গ্রুপে জায়গা পেয়েছে তরু।

মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি। গেটের দু'পাশে বাগানবিলাসের ঝাড়। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল তাহ্‌মীদ। লোহার গেট ঠেলে লাল ইঁট বিছানো রাস্তায় পা রাখল। গাড়ি-বারান্দায় সাদা একটা পাযেরো পার্ক করা, তার চারদিকে ভীড় করেছে একরাশ ছেলেমেয়ে। তরু আর মিলি ছাড়াও ওদের আরও দু'একজন বন্ধু-বান্ধবীকে চিনতে পারল তাহ্‌মীদ। একই গ্রুপে পড়ে ওরা। বেশীরভাগই বড়লোকের ছেলেমেয়ে, গাড়িটা নিশ্চয়ই ওদেরই কারও।

আর একটু কাছে যেতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তাহ্‌মীদ। পাযেরোর খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে অতি পরিচিত সেই আবহ, বিল্ট-ইন প্লেয়ারে বাজছে ওরই ক্যাসেট। বুঁদ হয়ে শুনছে ছেলেমেয়েরা, আধবোজা চোখ, দুলছে একটু একটু। যেন অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ডুবে আছে ওরা।

কাছে গিয়ে ডাকতে চোখ খুলল তরু, কিন্তু সেখানে আবেগের কোন চিহ্ন নেই। ভাইকে দেখে একটুও বিস্মিত হয়নি, শুধু বলল, 'কি দারুণ, তাই না, ভাইয়া?'

'কি করছিস্ তোরা এখানে?' অবাক হয়ে সবাইকে দেখতে লাগল তাহ্‌মীদ, এরা কি সব নেশা করেছে? কারও মুখে কোন কথা নেই, বুঁদ হয়ে আছে ভাবের জগতে।

'কি যে ভাল লাগছে, ভাইয়া! কোথায় পেলি এই মিউজিকটা, বল্ তো!'

'মিউজিক! কিসের মিউজিক? ওটা তো স্পেইস থেকে আসা সিগন্যাল...'

'ভাইয়া, তুই শুনতে পাচ্ছিস্ না? শোন্, কি চমৎকার...'

'আমার ক্যাসেটটা দিয়ে দে তরু, ওটা নিতে এসেছি আমি।'

'না, ভাইয়া, ক্যাসেটটা আমরা শুনছি। তুইও শোন্!'

ধৈর্য হারাল তাহ্‌মীদ। এরা এমন উদ্ভট আচরণ করছে কেন? কি

শুনছে এমন তন্ময় হয়ে? কি বোঝে ওরা মহাকাশ গবেষণার? রাগতকণ্ঠে তাহ্‌মীদ বলল, 'ক্যাসেটটা দে, তরু, আমি চলে যাই।'

টমি হিল ফিগারের টি-শার্ট পরা লম্বা-চওড়া স্মার্ট চেহারার ছেলেটা তরুর পাশে এসে দাঁড়াল, 'তরু, তোমার ভাই মিউজিকটা শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলে কিছুতেই ক্যাসেটটা চাইতে পারত না।'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছ তোমরা? আমি শুধু আমার ক্যাসেটটা ফেরত চাইছি,' বলতে বলতে গাড়ির ভেতরে হাত বাড়াল তাহ্‌মীদ ক্যাসেটটা বের করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে।

ছেলেটা একলাফে ওর পথ আটকে দাঁড়াল, গাড়ির মালিক সম্ভবত সে-ই। বাঁ হাতে আলতো করে ধাক্কা মারল তাহ্‌মীদের বুকে। হিংস্র স্বরে বলল, 'কানে যাচ্ছে না? কতবার বললাম ওটা আপনাকে দেয়া যাবে না!'

পিছন দিকে উল্টে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে টাল সামলাতে পারল তাহ্‌মীদ। হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ঘোরলাগা ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। ভাইকে অপমান হতে দেখেও তরুর কোন ভাবান্তর হলো না, কল্পিত সুরের মূর্ছনায় মজে আছে অন্য সবার মত। শুধু বলল, 'বাড়ি ফিরে যা, ভাইয়া। আমাদের হাতে অনেক কাজ। পৃথিবীর সবাইকে এই মিউজিক শোনাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'কি মিউজিক শুনতে পাচ্ছিস তোরা, বল তো?'

'বোঝাতে পারব না, ভাইয়া। এর সঙ্গে তুলনা করার মত কিছু নেই। সমস্ত শরীর দিয়ে শুনতে পাচ্ছি···মনে হচ্ছে যেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি! তুই কেন শুনতে পাচ্ছিস না?'

কান পেতেও গমগমে আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না তাহ্‌মীদ। কি অবাক কাণ্ড! কি শুনছে এরা এত মনোযোগ দিয়ে? বোনের হাত ধরল, 'বাড়ি চল্, তরু। আজ আর ক্লাস করার দরকার নেই।'

ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল তরু, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'বললাম তো, হাতে অনেক কাজ। সবাইকে শোনাতে হবে এই মিউজিক। পৃথিবীর সবাই মিলে না শুনলে এর আর মূল্য কি?'

এসময় কোন একটা গ্রুপের ক্লাস শেষ হলো মনে হয়। সিঁড়ি

বেয়ে নেমে আসতে লাগল এক ঝাঁক সুবেশী ছেলেমেয়ে। গাড়ি-বারান্দার কাছাকাছি এসে কথাবার্তা থামিয়ে দিল ওরা। মন্ত্রমুগ্ধের মত পায়ে পায়ে পাযেরোর চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তাহ্‌মীদের। এরা কি সবাই পাগল হয়ে গেল?

সোজা ল্যাবে চলে এল তাহ্‌মীদ। দোহা স্যার অফিসেই আছেন। দরজায় নক্ করল, 'স্যার, ল্যাবের চাবিটা একটু দেবেন? গতকাল যে ফাইলটা ডাউন লোড করেছিলাম, সেটা একটু দেখব।'

'কোথায় আছে ফাইলটা?' খোলা বইটা উল্টে রেখে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর দোহা।

'মেইনফ্রেমেই আছে, স্যার। প্যাটার্ন অ্যানালিসিস কিউতে,' লাজুক মুখে মাথা চুলকাল তাহ্‌মীদ, 'আর্ একবার কয়েকটা টেস্ট রান করতে চাই।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন ডক্টর দোহা, 'বাজে কাজে সময় নষ্ট করছ। অথচ জানো, গত কয়েকদিন ধরে ম্যাসিভ সোলার অ্যাকটিভিটি হচ্ছে। ওটা স্টাডি করলেও নতুন কিছু শিখতে পারতে। আচ্ছা, তুমি না একটা ক্যাসেটে টেপ করেছিলে? সেটা কোথায়?'

'আমার বোন সেটা নিয়ে নিয়েছে। ওর ধারণা কোন নতুন ধরনের মিউজিক ওটা।'

'মিউজিক!' অবাক হলেন ডক্টর দোহা। স্যারের পিছু পিছু ল্যাবের উদ্দেশে রওনা হলো তাহ্‌মীদ।

ধানমণ্ডীর সেই দোতলা বাড়ির সামনে ওদিকে মেলা বসে গেছে। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে পড়েছে বাগানময়। কেউ ছুটোছুটি করছে না, এমনকি কথাবার্তাও বলছে না। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত, একটু একটু দুলছে। পাযেরোর স্পিকার বেয়ে ইথারে ছড়িয়ে পড়ছে একটানা গমগমে শব্দের আবহ।

বিহ্বল মুখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন হান্নান স্যার। পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। বিস্মিত চোখে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলেন। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লেন, 'এখানে কি হচ্ছে এসব? আজকে কি স্ট্রাইক নাকি? পড়াশুনা হবে না?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। মনে হলো যেন কেউ শুনতেই পায়নি। ভীষণ রেগে গেলেন হান্নান স্যার। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন পাযেরোর দিকে। ড্রাইভার্স সাইডের জানালায় মাথা গলিয়ে ডান হাতে সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলেন উদ্ভট ক্যাসেটটা। হুঙ্কার ছাড়লেন বাঘের মত, 'এক্ষুনি বেরিয়ে যাও তোমরা এবাড়ির সীমানা থেকে! আর কখনও যেন তোমাদের চেহারা না দেখি!'

এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল টমি হিলফিগার। কোমরে হাত রেখে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি, স্যার! সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।' একলাফে পাযেরোর ড্রাইভার্স সিটে উঠে বসল, তিনচারজন ছেলেমেয়ে অনুসরণ করল ওকে। প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে গেল পাযেরো গেটের বাইরে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা মিছিল করে পিছু নিল। নিমেষে শূন্য হয়ে গেল বাগান। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন হান্নান স্যার। এরা কি সব পাগল হয়ে গেল!

তিন

গভীর রাতে নিজের রুমে কম্পিউটারের সামনে বসে আছে তাহ্‌মীদ। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, চ্যাট্-লাইনে টোকিওর বান্ধবীকে পেয়ে গেল।

'মোশি মোশি, মাইউমি, সব ভাল তো?'

'সুপ্রভাত, তাহ্‌মীদ, আবহাওয়া কেমন আজ?' উত্তর দিল মাইউমি। গত মাস দু'য়েক ধরে চ্যাট্-লাইনে আলাপ করছে ওরা। মুখোমুখি দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই অদূর ভবিষ্যতে। তবুও ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাইউমি তাহ্‌মীদের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট। হাইস্কুলের শেষ ধাপে পড়ছে।

খানিকক্ষণ খুচরো আলাপের পর আসল কথায় এল তাহ্‌মীদ। 'শোনো, তোমাকে একটা সাউন্ড-ট্র্যাক পাঠাব। ডাউনলোড করতে পারবে তো?'

'সাউন্ড-ট্র্যাক? কিসের সাউন্ড-ট্র্যাক?'

'আউটার স্পেসের ফাঁকা সিগন্যাল। অডিও ফাইলে পাঠাব। তুমি মন দিয়ে শুনো তো একটু। শুনে কি মনে হলো আমাকে জানিয়ো, কেমন?'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাহ্‌মীদ কী-বোর্ড নিয়ে। বেশ গরম পড়েছে আজ। মাথার উপর ফুল-স্পীডে ঘুরছে পাখাটা, তারপরেও দরদর করে ঘাম হচ্ছে। রাতের অন্ধকারেও গরম যেন কমছে না। টেবিল ল্যাম্পের নরম আলোটা পর্যন্ত গরম ছড়াচ্ছে মনে হয়।

'তুই এখনও ঘুমাস্‌নি?'

চমকে পিছু ফিরল তাহ্‌মীদ। আবছা আঁধারে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বাবা। 'এই···না···মানে···'

'এভাবে রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে যে,' তাহ্‌মীদের বিছানায় বসতে বসতে বললেন তিনি। 'পরীক্ষা শুরু হতে বেশি দেরি নেই, শরীরের যত্ন নিতে হয়।'

'এই তো, বাবা, একটু পরেই শুয়ে পড়ব,' প্রমাদ গুণল তাহ্‌মীদ, এতরাতে বিছানায় জাঁকিয়ে বসেছেন কেন? নিশ্চয়ই বড়সড় একটা লেকচার শুনতে হবে।

'তরুর ব্যাপারটা কি বলতে পারিস্? কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে সে সেই সকাল থেকে।'

'সেটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি আমি, বাবা,' উৎসাহে সোজা হয়ে বসল তাহ্‌মীদ।

হাত নেড়ে বাধা দিলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'ওই আওয়াজটা বন্ধ কর তো! কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে! কিসের শব্দ ওটা?'

ভল্যুমের নবটা বাঁ পাশে ঘুরাতে ঘুরাতে হাসল তাহ্‌মীদ, 'তরু আর ওর বন্ধুদের ধারণা এটা দারুণ একটা মিউজিক। কাল রাত থেকে এই ক্যাসেটটাই শুনছিল তরু। কিন্তু আসলে ক্যাসেটটা আমার। ওতে আউটার স্পেস থেকে আসা রেডিও সিগন্যাল টেপ করা আছে।'

'কোথায় পেলি ওটা?'

'ল্যাব থেকে টেপ করেছি আমি নিজেই। তরুর ধারণা ওটা মিউজিকের টেপ। আমিও নানাভাবে শোনার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন

সুর-তাল-লয়-ছন্দ ধরতে পারিনি। শুধু বুঝতে পেরেছি, সাব-হারমোনিক্সটা অসম্ভব জটিল। আচ্ছা বাবা, এমনও তো হতে পারে এই রেডিও-সিগন্যালে কোন একটা মেসেজ আছে, যা আমরা ধরতে পারছি না। শুধু তরু আর ওর বন্ধুরাই বুঝতে পারছে!'

'শেষ পর্যন্ত তোর মাথাটাও খারাপ হলো নাকি! এই রাত জাগার অভ্যেসটা...'

'বাবা, এটা আমার কল্পনা নয়। গত কয়েকদিন ধরেই আমি ওটা শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে। আমি যা ধরতে পারিনি, তরু তা পেরেছে।'

'শুয়ে পড়ু, খোকা। অনেক রাত হলো,' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সালাহ্ উদ্দীন।

'তুমি সত্যিই ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়েছে!'

'না। আমি জানি তরুর জন্যে চিন্তা হচ্ছে তোর। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছিস। বোনকে ভালবাসিস বলেই তো তা করছিস্। মাথা কেন খারাপ হবে? তবে তুই যেভাবে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিস্, সেটা লজিক্যাল না। ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ্, কেউ ড্রাগ-ফাগ নেয় কিনা। তোর মা তো সারাক্ষণ কান্নাকাটি করছে! কি যে করি!' মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বেরিয়ে গেলেন সালাহ্ উদ্দীন।

নিলুফার আজ মেয়ের ঘরে শুয়েছেন। মাইল্ড্ সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তরুকে।

সকালে তরুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত জেগে ভোরের দিকে ঘুমটা লেগে এসেছিল, নিলুফার টের পাননি তরু কখন উঠে পড়েছে। কাজের ছেলেটা সদর দরজা খোলা পেয়েছে সকালে। তরুর মত শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে মাকে না বলে বাড়ির বাইরে যাবে, তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। গতকালের অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে নিশ্চয়ই এর সম্পর্ক আছে। ডাক্তার সালাহ্ উদ্দীন তরুর বন্ধুবান্ধব-যাদের বাড়িতে টেলিফোন আছে-সবাইকে একে একে ফোন করতে লাগলেন। নিলুফার হাউমাউ করে কাঁদছেন।

দিশেহারা তাহ্মীদ বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। মিলিদের বাড়িটা

কাছেই, হেঁটে চলে গেল সেখানে। জানা গেল তরু সকালে এবাড়িতে এসেছিল। মিলিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলশানে আর এক বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশ্যে। আজ ছুটির দিন, মিলির মা আপত্তি করেছিলেন অতদূরে যেতে দিতে। কিন্তু মেয়েরা শোনেনি। ভীষণ খেপে আছেন তিনি তরুর উপর, ওই মেয়েই যত নষ্টের গোড়া। মিলির মায়ের কাছ থেকে গুলশানের ঠিকানা নিয়ে বাসে উঠে পড়ল তাহ্‌মীদ, তার আগে পাবলিক ফোন থেকে বাসায় কল করে জানাল সবকিছু।

নম্বর মিলিয়ে গুলশানের যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা বাড়ি নয়—প্রাসাদ। গেটের দু'পাশে দুটো সুন্দর পাইন গাছ, ছড়ানো ফুলের বাগান। ধপধপে সাদা বাড়িটার মাথায় বিদেশী ধাঁচের লাল টালি বসানো ঢালু ছাদ। ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান গেট খুলে দিতে পিচঢালা রাস্তা ধরে পর্চে এসে দাঁড়াল তাহ্‌মীদ। কারুকাজ করা ভারী কাঠের সদর দরজার ঠিক পাশে সাদা ছোট্ট একটা বোতাম, তাতে চাপ দিতেই রিনরিনে শব্দ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। প্রায় বৃদ্ধ একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ বাড়িতে কাজ করে। তাহ্‌মীদ কিছু বলার আগেই সে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'আসেন ভাইয়া, সবাই পিছনের হলঘরে আছে।' লোকটার পিছু পিছু হলঘরে চলে এল তাহ্‌মীদ। জানালার ভারী পর্দা টেনে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে বিশাল ঘরটা। কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশজন কিশোর-কিশোরী ভীড় করেছে সেখানে, কেউ আধশোয়া হয়ে আছে সোফায়, কেউ বা শুয়ে আছে কার্পেটে। সাউন্ড সিস্টেমটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে, কিন্তু ফুল ভল্যুমে বাজছে সেই ক্যাসেটটা। গুম গুম গুম গুম।

অন্ধকারটা চোখে সয়ে এলে তরুকে খুঁজতে লাগল তাহ্‌মীদ, গলা তুলে ডাকল; 'তরু! অ্যাই তরু!' কোন জবাব এল না। এদিক-ওদিক দেখার চেষ্টা করল। মিলি না? হ্যাঁ, ওই তো মিলি! দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখ বুজে। শুয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের গা বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে মিলির কাছে পৌঁছল সে, 'মিলি, তরু কোথায় দেখেছ?

অনেক কষ্টে চোখ খুলল মিলি, 'কে?'

'আমি...আমি তাহ্‌মীদ! তরু কোথায় জানো?'

'তরু? ও! কি জানি! কি ভাল লাগছে, তাই না, ভাইয়া?' আবেশে

চোখ বুজল মিলি।

অসহায়ের মত চারদিকে তাকাল তাহ্‌মীদ। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা মেয়ের মুখ দেখার চেষ্টা করল। কোথায় তরু?

অবশেষে খুঁজে পেল। জানালার পাশে লেদারের সোফায় পা তুলে বসে আছে তরু, মুখ গুঁজে আছে হাঁটুতে। জানালার পর্দাটা টান মেরে সরিয়ে দিল তাহ্‌মীদ, তরুর হাত ধরে টানল, 'কি করছিস, তুই এখানে? চল্, বাড়ি চল্! আম্মা ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'

যেন অনেক কষ্টে মুখ তুলল তরু, জড়ানো কণ্ঠে অস্ফুটে বলল, 'কে? ভাইয়া?'

ইলেক্ট্রিক শক্ খাবার মত চমকে উঠল তাহ্‌মীদ। তরুর মাজা মাজা মসৃণ গালে সবজেটে মত একটা ঘা। আধুলির মত সাইজ, জানালা দিয়ে আসা আলোয় কেমন যেন চকচক করছে। কি হয়েছে তরুর? পুড়ে গেছে? না, পোড়ার ঘা তো এমন নয়! ভয় পেয়ে তরুর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল তাহ্‌মীদ, 'অ্যাই, তোর কি হয়েছে, তরু? ব্যথা পেয়েছিস্ কেমন করে?' বলতে বলতেই লক্ষ্য করল তরুর পাশেই সোফায় শুয়ে থাকা মেয়েটির ঠোঁটের কোণে ওই একইরকম ঘায়ের চিহ্ন। ঘোর ভাঙল না তরুর, মুখ ফিরিয়ে গুটিসুটি মেরে সোফায় এলিয়ে পড়ল আবার।

দিশেহারার মত বেরিয়ে এল তাহ্‌মীদ ওখান থেকে। করিডরের কোথায় যেন একটা টেলিফোন দেখেছিল ঢোকার সময়। ওই তো টেলিফোনটা! কাশ্মীরী কাঠের ছোট্ট টেবিলটার উপরে রাখা, পাশে গদিমোড়া একটা টুল। কারও অনুমতি নেবার মত সময় নেই। রিসিভার তুলে দ্রুতহাতে ডায়াল করতে শুরু করল বাড়ির নাম্বারে।

ওদিক থেকে ফোন তুললেন সালাহ্ উদ্দীন, 'হ্যালো!'

'বাবা, হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এক্ষুনি চলে এসো এখানে। আমি ঠিকানা দিচ্ছি...'

'কি হয়েছে তরুর? ঠিক করে বলছিস না কেন?' উৎকণ্ঠায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'কিছু বলার মত সময় নেই, বাবা! তরুর...মানে এখানে সবার কি যেন হয়েছে...আমি বুঝতে পারছি না। পারলে আরও কয়েকজন

ডাক্তার নিয়ে এসো সঙ্গে, প্লিজ!'

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে তরু। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ওকে। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা তরুকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। শুধু গালে নয়, কপালে চুলের ধারে আর চিবুকেও ঘা দেখা দিয়েছে। আঙুলের নখের রঙ পর্যন্ত বদলে গেছে, স্বচ্ছ সবজেটে আভা দেখা যাচ্ছে নখের নিচে। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্রী ঘা সারা শরীরে।

পাথরের মূর্তির মত তরুর পায়ের কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন নিলুফার। তাঁর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন বড় বোন দিলারা বেগম, খবর পেয়ে শান্তিনগর থেকে ছুটে এসেছেন।

'বাবা, কিছু বুঝতে পারলে?' জানতে চাইল তাহ্মীদ।

তরুর মাথার কাছে দাঁড়ানো সালাহ্ উদ্দীন চিন্তিত ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে, 'এখনও নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। কোন ধরনের পয়জনিং বলে মনে হচ্ছে। হার্টবিট অনিয়মিত। রক্তে আর চামড়ায় একধরনের ধাতব পদার্থ পাওয়া গেছে।'

'তরু ভাল হয়ে উঠবে তো, বাবা?'

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সালাহ্ উদ্দীন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'রোগটা কি না জানলে চিকিৎসাই তো করা যাচ্ছে না। সব মিলে আটাত্তর জন ছেলেমেয়েকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। কমবেশী একইরকম সিম্পটম। আমি হেলথ্ মিনিস্ট্রিতে খবর দিয়েছি...'

এমন সময় গগনবিদারী চীৎকার জুড়ে দিল তরু, 'আম্মা...ও আম্মা...আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না! কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!...' শোয়া থেকে উঠে বসেছে সে, অন্ধের মত বাতাস হাতড়াচ্ছে। ওকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন নিলুফার। সালাহ্ উদ্দীন চোখের ইশারা করতে দিলারা বেগম জোর করে বোনকে টেনে নিয়ে গেলেন করিডরে। অপথ্যালমোস্কোপ অ্যাপ্রনের পকেট থেকে বের করে তরুর চোখ পরীক্ষা করতে লাগলেন সালাহ্ উদ্দীন। থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা।

ঝট্ করে সাইড টেবিলে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'অপথ্যালমোলজী? ডাক্তার বানু আছেন?···হ্যাঁ, আমার মেয়ে বলছে সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না। যতটুকু দেখলাম, কোন ধরনের ক্রেনিয়াল অ্যাবনরম্যালিটিতে ভুগছে। তুমি একটু দেখবে? হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।'

ওদিকে অপথ্যালমোস্কোপ তুলে নিয়েছে তাহ্মীদ। মোটা কাঁচের এপাশ থেকে তরুর চোখটা দেখার চেষ্টা করল। আশ্চর্য! টুকরো টুকরো জরীর গুঁড়োর মত সোনালী কি যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ভীষণ চমকে গেল তাহ্মীদ। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা! ওর চোখের আইরিস বদলে যাচ্ছে!'

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল তরু, 'ভাইয়া···ও ভাইয়া, আমার কি হয়েছে রে, ভাইয়া···'

ডক্টর হুসনা বানুর অফিসে অপেক্ষা করছেন সালাহ্ উদ্দীন তাহ্মীদকে নিয়ে। দেয়ালে তরুর চোখের এক্স-রেটা টাঙানো রয়েছে। আইরিসের জায়গাটুকু খরার রুক্ষ জমির মত ফাটা ফাটা। সেখানে টোকা দিলেন তিনি, 'দ্যাখ্, কি অদ্ভুত ব্যাপার! যে জিনিসটা কর্নিয়াকে প্রোটেক্ট করে, সেখানকার কেমিক্যাল কমপোজিশন বদলে গেছে।'

রোগী দেখার টেবিলে বসে আছে তাহ্মীদ, প্রশ্ন না করেও বুঝল বাবা এর কোন ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। ডক্টর বানু ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। ছোটখাট ফর্সামত চেহারা, চোখে ভারী চশমা। বয়স বোঝা দায়।

'নতুন কিছু জানা গেল?' উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেছে সালাহ্ উদ্দীনের।

'না, স্যার,' দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি, 'শুধু জানা গেছে জীবাণু বাতাসে ছড়াচ্ছে না।' তাহ্মীদের দিকে ফিরলেন, 'রোগীদের কাছাকাছি এসেছে এমন সবার রক্ত পরীক্ষা করছি আমরা। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি। ফ্লুইড বা বডি কন্ট্যাক্ট থেকেও সংক্রমণ ঘটতে পারে।' তাহ্মীদের কনুইয়ের উপরে রবারের বাঁধুনি দিতে দিতে চোখ তুলে তাকালেন, 'নড়বে না কিন্তু, কেমন?'

'কিন্তু রোগ কি, আপনারা বুঝতে পারছেন না?'

'কোন এক ধরনের ক্রোমোফোব অ্যাডিনোমা। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের অসুখ, যেটা ত্বকের মেলানিনে এফেক্ট করছে–যার কারণে রক্তে এনডোরফিন রিলিজ হচ্ছে।' অভ্যস্ত হাতে ত্বকে সুঁই ফুটিয়ে দিলেন ডক্টর বানু।

চমকে উঠল তাহ্‌মীদ, 'এনডোরফিন! মানে ড্রাগ! ওটা তো শরীরে ড্রাগের মত কাজ করবে!'

সালাহ্‌ উদ্দীন এতক্ষণে কথা বলে উঠলেন, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, এ পর্যন্ত যারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা সকলেই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ধ নয় কেউই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর বানু, 'হয়তো এমন কিছু তারা নিয়েছে, যা এই ছেলেটি নেয়নি। সেকারণেই বেঁচে গেছে ও। অন্তত এখন পর্যন্ত ভাল আছে তো!' আড়চোখে একবার তাকালেন সালাহ্‌ উদ্দীনের দিকে, তারপর তাহ্‌মীদের দিকে ফিরলেন, 'তুমি কি ওদেরকে কোন ড্রাগ নিতে দেখেছ?'

অস্বস্তিবোধ করল তাহ্‌মীদ। 'নাহ্‌! তরু ড্রাগ নিতেই পারে না। ওরকম মেয়ে না সে। আমার যতদূর মনে হয়,' বলতে বলতে জিনসের পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে তুলে ধরল সে, 'এর সঙ্গে যোগ আছে পুরো ব্যাপারটার। পাগলের মত এই ক্যাসেটটা শুনছিল ওরা সবাই। চেষ্টা করেও কেড়ে নিতে পারিনি।'

'ক্যাসেট! কিসের ক্যাসেট' ওটা?' বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বাস করছেন না ডক্টর বানু।

'একটা রেডিও-সিগন্যাল। আচ্ছা, অন্য কোন জায়গায় কি এই রোগ ছড়িয়েছে?'

'কি জানি...তেমন কিছু...'

'একটু খবর নেবেন, প্লিজ? এই ক্যাসেটটা আমি জাপানে এক বন্ধুর কাছেও পাঠিয়েছিলাম। ওখানেও রোগটা ছড়িয়ে থাকতে পারে।' একটু ইতস্তত করে ক্যাসেটটা নিলেন ডক্টর বানু, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন খবর নেব। কিন্তু কোন বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড তো আর কোন রোগের কারণ হতে পারে না!'

'এখন কি তরুকে একটু দেখতে পারি?'

'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু ভয় পেয়ো না যেন,' আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ওর পিঠে চাপড় দিলেন ডক্টর বানু। 'তরুকে অক্সিজেন টেন্টে রাখা হয়েছে, তাতে ব্যথাটা একটু কমেছে।'

লম্বা লম্বা পায়ে তরুব ওয়ার্ডের উদ্দেশে রওনা হলো তাহ্‌মীদ। ছাব্বিশ নাম্বার ওয়ার্ডটা হাসপাতালের অন্য অংশ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। করিডরে উৎকণ্ঠিত আত্মীয়স্বজনের ভীড়, মাস্ক-পরা নার্স আর কর্মচারীরা তাদেরকে সামলাচ্ছে। দিলারা বেগম জোর করে নিলুফারকে বাড়ি নিয়ে গেছেন গোসল-গা ধুইয়ে একটু বিশ্রাম করিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। একবারে একজনের বেশী ভিজিটার ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। দরজায় ভারী পলিথিনের একটা পর্দা ঝুলানো হয়েছে। ভেতরে যাবার জন্যে মাস্ক আর কাপড়ের জুতো পরতে হলো। ভেতরে সারি সারি বেডে শুয়ে আছে আক্রান্ত ছেলেমেয়েরা। প্রত্যেকটা বেডই অক্সিজেন টেন্ট দিয়ে ঢাকা। ভেতরে আবছা দেখা যাচ্ছে বীভৎস ঘায়ের যন্ত্রণায় কোকাচ্ছে রোগীরা, নিচুস্বরে কাঁদছে। ঘুমের ওষুধে অচেতন হয়ে আছে কেউ কেউ। টমি হিলফিগার গায়ে সেই ছেলেটাকেও দেখতে পেল তাহ্‌মীদ, চেহারার বেশীর ভাগ অংশই ঢেকে গেছে ঘিনঘিনে ক্ষতে। দু'পাশে হাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, অচেতন। একা। ওর বাডি থেকে কি কেউ আসেনি? নাকি খবর পায়নি এখনও? ভারী মায়া হলো। এমন তাজা টগবগে সুন্দর ছেলেটা! অথচ এখন কি করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে! ওর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াল তাহ্‌মীদ। বার বার চোখ ভরে যাচ্ছে জলে। খোদা, এদের সবাইকে তুমি ভাল করে দাও!

মিলিকেও দেখতে পেল এক ঝলক। ওর মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছে, সম্ভবত বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। হাসপাতালের গাউনের হাতার নিচে ওর দু'হাতের পিঠেই দগদগে ঘা। জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিল তাহ্‌মীদ।

ওয়ার্ডের শেষ মাথায় ভারী স্বচ্ছ প্লাস্টিকে ঢাকা জানালার পাশের বেডে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তরু। খোলা নিষ্প্রাণ চোখদুটো ছাদের দিকে স্থির হয়ে আছে। গলা পর্যন্ত নেমে এসেছে ঘা, দু'হাত প্রায় ঢেকে গেছে নীলচে সবুজ খণ্ড খণ্ড ক্ষতে। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা

যায়, প্রত্যেকটা ঘায়ের কিনারা ঘিরে কেমন যেন হলদেটে আভা। কোনরকম পুঁজ বা রক্তক্ষরণের চিহ্ন নেই—আশ্চর্য ব্যাপার!

লোহার চেয়ারটা টেনে বসতে যেতেই ঠুং করে শব্দ হলো। টেন্টের ভিতর চমকে উঠে বসল তরু, 'কে? কে···আম্মা? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না···'

'আমি। নড়াচড়া করছিস কেন? শান্ত হ।' অনেক কষ্টে আবেগ চেপে রাখল তাহ্‌মীদ।

দগদগে ঘায়ে ভরা ডান হাতটা বাড়িয়ে টেন্টের দেয়াল ছুঁলো তরু, 'ভাইয়া···কি ভীষণ ব্যথা রে, ভাইয়া···'

'ঠিক হয়ে যাবে সব, একটু ধৈর্য ধর।'

'ভাইয়া, মিলি কোথায়? কেমন আছে ও?'

'ভাল আছে। এই তো দেখে এলাম হাঁটছে ওর মায়ের সঙ্গে। তোর অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ।'

'মিউজিকটা কেন কেড়ে নিলি, ভাইয়া? ওটা এনে দে! প্লিজ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না! এনে দে···'

'তা হয় না, বুড়ী! ওটার জন্যেই তো তোদের এই অবস্থা। ডাক্তাররা চেষ্টা করছেন ওষুধ বের করবার। লক্ষ্মী বোন আমার, একটু সহ্য কর্!'

'আমি জানি, ভাইয়া, ওটা শুনতে পেলে ভাল হয়ে যেতাম! কেন এভাবে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস তোরা!' হু-হু করে কেঁদে উঠল তরু।

'মাফ করে দে আমাকে, বুড়ী! আমার দোষেই তোর এই অবস্থা,' আর পারল না তাহ্‌মীদ, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'আমি আর বাঁচব না, তাই না, ভাইয়া?' তরুর প্রাণহীন দুচোখের কোল বেয়ে নদীর মত অশ্রু বইছে। 'কিটির দিকে খেয়াল রাখিস, মনে করে প্রতিদিন খাবার দিস্ কিন্তু।' মাস তিনেক আগে বেড়ালের বাচ্চাটাকে বাসার পিছনের জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছে তরু। এরমধ্যেই আদরযত্ন পেয়ে বেশ গাট্টাগোট্টা হয়ে উঠেছে কিটি।

পলিথিনের এধার থেকে তরুর হাতের উপর হাত রাখল তাহ্‌মীদ। প্রাণভরে অনুভব করতে চাইল ক্ষীণ উত্তাপটুকু।

লোহার চেয়ারে বসেই ঘাড় গুঁজে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কত রাতে

কে জানে, ঘাড়ে কেউ হাত রেখেছে টের পেয়ে চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। ওহ্! বাবা!

'একটু বাইরে আয়,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'শব্দ করিস্ না, ও ঘুমাচ্ছে।'

চোখ ডলতে ডলতে সালাহ্ উদ্দীনের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল তাহ্মীদ। ওয়ার্ডের বাইরে করিডরের শেষমাথায় ছোট্ট একটা অফিসে এসে ঢুকল ওরা। চারদিক শুনশান; ডাক্তার-নার্স কেউ কোথাও নেই। শুধু দু'তিনজন অ্যাটেনডেন্ট টুলে বসে ঢুলছে করিডরে।

'তোর ব্লাড টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। ইনফেকশনের কোন চিহ্নই নেই।'

'কিন্তু তা কেমন করে হয়? তরু অসুখে পড়ে গেল, ওর বন্ধুদের সব এক অবস্থা। আর আমিই শুধু বেঁচে গেলাম?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। এখন বাড়ি যা। রাত অনেক হয়েছে। এখানে থেকে কোন লাভ নেই। রাত জেগে শেষে শরীর খারাপ করবে। আমি তো আছিই, কোন চিন্তা করিস্ না।'

'বাবা,' একটু ইতস্তত করে মুখ তুলল তাহ্মীদ, 'তরু কি মরে যাচ্ছে?'

কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইলেন সালাহ্ উদ্দীন, কপালের ডান পাশের মোটা রগটা তিরতির করে উঠল, ধরা গলায় অবশেষে বললেন, 'যা, বাড়ি যা এখন।'

বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় ভোর হয়ে গেল। নিলুফার শান্তিনগরে বোনের বাড়িতে আছেন, ওঁর দিশেহারা অবস্থা দেখে দিলারা বেগম প্রায় জোর করেই নিয়ে গেছেন। ভালই হয়েছে, ভাবল তাহ্মীদ। আম্মা একটুতেই অস্থির হয়ে পড়ে। বড় খালাম্মার কাছে যত্নেই থাকবে। হাতমুখ ধুয়ে উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল তাহ্মীদ। বৃথাই এপাশ ওপাশ করা। ঘুম আসছে না।

সদর দরজায় খুট করে শব্দ হলো, খবরের কাগজ দিয়ে গেল বোধহয়। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। দরজার তলা থেকে কাগজটা

নিয়ে এসে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল সে। খবরগুলো পড়লেও কিছুটা সময় তো কাটবে। কাগজের ভাঁজ খুলতেই লাফিয়ে উঠল মোটা হেডলাইন, 'অজানা ব্যাধির আক্রমণে ভীত শহরবাসী'! খবরে বলা হয়েছে, অজানা চর্মরোগে আক্রান্ত শতাধিক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রোগ নির্ণয় করা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে লিজনেয়ার ভাইরাসের মত কোন জীবাণুই এই সংক্রমণের জন্যে দায়ী। নিচের দিকে ছোট্ট করে ছাপা একটা খবরও ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্পেইস শাট্‌ল্ কলাম্বিয়ার বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক সাব্‌স্পট অ্যাকটিভিটির সোলার মেজারমেন্ট শেষ করেছেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বর্ধিত সোলার অ্যাকটিভিটি আগামী কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর ওয়েদার প্যাটার্নে প্রভাব ফেলবে…

নাহ্! কোন কিছুতেই মন বসছে না। অস্থির পায়ে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াল। কি নিস্তব্ধ আর ফাঁকা লাগছে প্রতিদিনের অভ্যস্ত এই বাসাটাকে। বাবা এখনও ফেরেনি হাসপাতাল থেকে। রান্নাঘরের দরজায় কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে মন্টু। মিটসেফের তলা থেকে বেরিয়ে এল কিটি, রাজকীয় চালে গলা টানটান করে হাই তুলল। কিটিকে দেখেই একটা আইডিয়া মাথায় খেলে গেল। এগিয়ে গিয়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিল তাহ্‌মীদ। সোজা চলে এল নিজের ঘরে। কিটিকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফুল ভল্যুমে চালিয়ে দিল মহাশূন্যের সুরহীন সেই সঙ্গীত। আলতো করে কিটির গায়ে হাত বুলাল তাহ্‌মীদ, 'বুঝলি, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। মাইন্ড করিস্ না যেন। যতদূর মনে হয় তোর কোন ক্ষতি হবে না।' কিটি অবশ্য ওকে একটুও পাত্তা দিল না, আয়েশী ভঙ্গিতে চোখ বুজে শুয়ে আছে টেবিলে। ক্যাসেটের শব্দটা ওকে বিচলিত করতে পারেনি। কি মনে করে জানালায় রাখা ছোট্ট মানিপ্ল্যান্টের টবটা নিয়ে এসে কিটির পাশে রেখে দিল তাহ্‌মীদ। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। কে যেন জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। চমকে উঠে বসল তাহ্‌মীদ। জানালায় সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে। কে এভাবে দরজা ধাক্কাচ্ছে? তরুর কিছু হলো না তো? হুড়মুড় করে উঠে দরজা খুলে দিল সে, উৎকণ্ঠায়

টানটান হয়ে আছে স্নায়ু।

সামরিক পোশাক পরা তরুণ এক সৈনিক বুটের শব্দ তুলে মড়মড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল তাহ্‌মীদ।

'তুমিই তাহ্‌মীদ?' কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে লোকটা, ভাবলেশহীন চেহারা।

'কে আপনি? কি চান...'

সালাহ্‌ উদ্দীন ঘরে ঢুকলেন ক্লান্ত পায়ে, সঙ্গে আরও একজন সৈনিক। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বয়ে এনেছে লোকটা, বিনাবাক্যব্যয়ে টেবিলের টুকিটাকি জিনিসপত্র বাক্সে ভরতে লাগল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল তাহ্‌মীদ, 'বাবা, কি হচ্ছে এসব? কারা এরা?'

'চিন্তার কিছু নেই, ওরা ওদের কাজ করছে। বাধা দিস্‌ না।'

'বাবা...ওরা আমার জিনিসপত্র ঘাঁটছে কেন? এই যে...সাবধানে... ওটা আমার ডিস্কেট বক্স...'

'শান্ত হ, খোকা। অনেক কিছু ঘটে গেছে গত কয়েক ঘণ্টায়। টোকিওর ব্যাপারে তোর সন্দেহটা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানেও এই একই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আমাদের দেশের সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে দু'ঘণ্টা আগে। ঢাকা শহর এখন পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, সব ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে বাইরে এ রোগ না ছড়াতে পারে। তোর গবেষণার সব জিনিসপত্র সহ তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তুই ওখানকার ডাক্তারদের সাহায্য করবি।'

সেনাবাহিনীর জোয়ান দু'জন ধরাধরি করে কম্পিউটারটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। মাথায় হাত দিয়ে বিছানায় বসে পড়ল তাহ্‌মীদ, 'হায় আল্লাহ্‌! এ আমি কি করলাম!'

ওর কাঁধে হাত রাখলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, 'তোর কোন দোষ নেই, খোকা। তোর কথায় কান না দিয়ে বরং আমিই ভুল করেছি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে দু'হাতে মুখ ঘষছিল তাহ্‌মীদ। হঠাৎ পাথরের মত জমে গেল সে, এক লাফে হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখের সামনে মেলে ধরল কাঁপা কাঁপা দু'হাতের পাঞ্জা। প্রায়

ফুঁপিয়ে উঠল, 'বাবা!'

'কি রে, এমন করছিস কেন? বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই...' বলতে বলতে ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে মেলে ধরা হাতের দিকে তাকালেন তিনি। থরথর করে কেঁপে উঠলেন নিজের অজান্তেই। তাহ্‌মীদের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘিনঘিনে সবুজ ঘা!

চার

মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ব্লকের চারতলার কনফারেন্স রুমে জরুরী মীটিং বসেছে। শুধু মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরাই নন, কয়েকজন মন্ত্রী সহ বেশ ক'জন সরকারী আমলাও উপস্থিত। সামরিক বাহিনীর প্রধানও বাদ যাননি। ডা. সালাহ্ উদ্দীন আর তাহ্‌মীদ পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসেছে। চওড়া টেবিলের ঠিক ওপাশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডাক্তার নুরুল ইসলাম খান। টাইপ করা একটা রিপোর্ট পড়ছেন তিনি, 'এই রোগের উৎপত্তি হচ্ছে কোন বিশেষ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির সাবহার মনিক্সের সেল্যুলার রিয়্যাকশন থেকে। সোজা ভাষায়—শব্দের প্রতি শারীরিক প্রতিক্রিয়া। কোয়ারান্টিন করার পরেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কয়েক লাখে পৌঁছে যাবে, যদি বর্তমান হারে সংক্রমণ হতে থাকে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে কোয়ারান্টিন করেও তেমন লাভ কিছুই হবে না।'

টেবিলের মাথায় উপবিষ্ট পুরো ইউনিফর্ম পরা সেনাবাহিনী প্রধান মুখ খুললেন, 'শব্দ থেকেই যদি সংক্রমণ ঘটছে, তাহলে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে এত অসুবিধা হচ্ছে কেন?'

এবারে উত্তর দিলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'শব্দটা সবাইকে আক্রমণ করছে না, শুধু বিশেষ বিশেষ কয়েকজনই মিউজিক হিসেবে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে এবং আক্রান্ত হচ্ছে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগী একধরনের ইউফোরিয়াতে ভুগছে, যার প্রভাব অনেকটা মাদকদ্রব্যের মত। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে এরা অদম্য একধরনের মানসিক চাপ অনুভব

করছে এই তথাকথিত মিউজিক আরও অনেককে শোনানোর জন্যে।'

ঘি রঙা সাফারি পরনে ঢাকার ডি.সি. নড়েচড়ে বসলেন, 'শহরের প্রায় সব এলাকাতেই অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা স্পিকারে এই মিউজিক বাজিয়ে পার্টি করেছে দিনরাত। সেকারণেই সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে কারফিউ জারী করতে হয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো আর আমরা দেখতে পারছি না।'

'আপনারা বলছেন এই সিগন্যাল আসছে মহাশূন্য থেকে?' জানতে চাইলেন ডাক্তার খান।

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত,' এতক্ষণে মুখ খুললেন ড. দোহা। 'প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে আমরা মনিটর করছি, এই সিগন্যাল অনবরত কোন ছেদ ছাড়া পাঠানো হচ্ছে। আরও একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, এই সিগন্যাল প্রাকৃতিক নয়।'

'প্রাকৃতিক নয়!' বিহ্বল কণ্ঠে, অনেকটা স্বগতোক্তি করার ভঙ্গিতে ডা. হুসনা বানু বলে উঠলেন, 'তাহলে কে পাঠাচ্ছে এই সিগন্যাল?'

'আমরা তা জানি না,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. দোহা। 'সিগন্যালের কম্পোজিশন সাংঘাতিক জটিল। কোন মেসেজ থেকে থাকলেও তার মর্মোদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব।'

'আমার মতামত যদি জানতে চান,' প্রায় গর্জে উঠলেন দশাসই সেনাবাহিনী প্রধান, 'ভিনগ্রহের প্রাণীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিছু টের পাবার আগেই মরে ভূত হয়ে যাব আমরা।'

'যুদ্ধ কিনা জানি না, তবে যারা এই সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, তারা আমাদের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক বেশী উন্নত। সারা পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে এই সিগন্যাল পাঠানো হয়েছে, সবাই চেষ্টা করছেন এর মানে উদ্ধার করতে। রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যেও দিনরাত খাটছেন বিভিন্ন দেশের সেরা বিজ্ঞানীরা।'

এবারে প্রশ্ন করলেন ডি.সি., 'যারা এই সিগন্যাল নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন না?'

'না,' বললেন সালাহ্ উদ্দীন, 'প্রাপ্তবয়স্করা আক্রান্ত হচ্ছে না। শুধুমাত্র অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরাই ভুগছে। তেরো থেকে উনিশ/বিশ বছরের ছেলেমেয়েরাই শুধু আক্রান্ত হয়েছে। বাচ্চা-বুড়ো, যুবক-যুবতী

বাদ।'

'শুধু মানুষ নয়,' পায়ের কাছে রাখা কাপড়ের ব্যাগ থেকে কিটিকে বের করে টেবিলে রাখল তাহ্‌মীদ, 'জন্তু-জানোয়ারের উপরেও সিগন্যাল প্রভাব ফেলছে। দেখুন!' অসুস্থ কিটি এলিয়ে শুয়ে আছে তাহ্‌মীদের হাতে মাথা রেখে, মৃদুমৃদু কাঁপছে। যারা কাছে বসে আছেন, তারা দেখতে পেলেন কিটির থাবার নিচে আর চোখ-মুখে সবজেটে আভা।

'তুমিই তো সবচেয়ে আগে এই সিগন্যাল শুনতে পেয়েছ, তাহলে তোমার কিছু হলো না কেন?' জানতে চাইলেন ডি.সি.।

একে একে সবার দিকে তাকাল তাহ্‌মীদ, তারপর দু'হাত তুলে ধরল সামনে, যাতে সবাই দেখতে পায়। 'আমিও আক্রান্ত। এই যে, দেখুন।' পাশে বসা একজন সরকারী আমলা চট্ করে চেয়ার সহ একটু দূরে সরে বসলেন।

'ভয়ের কিছু নেই,' অভয় দেবার ভঙ্গিতে বললেন ডা. হুসনা বানু। 'এভাবে সংক্রমণ হবে না। তাছাড়া আপনার যা বয়স, তাতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাই নেই। তাহ্‌মীদের বয়স বিশ বছর প্রায়, সেকারণেই আক্রান্ত হতে বেশী সময় নিয়েছে ও। যে বয়স পর্যন্ত সংক্রমণ ঘটছে, তাহ্‌মীদ সে বয়সের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। আর ক'মাস বেশি হলে ও আর আক্রান্ত হত না। সেজন্যেই সিগন্যালটা পুরোপুরি ধরতে পারছিল না সে। এক্ষেত্রে সংক্রমণও ঘটেছে খুব ধীরগতিতে।'

'তার মানে, ওরা আমাদের বাচ্চাদেরই শুধু ক্ষতি করতে চাইছে?' বলে উঠলেন সেনাবাহিনী প্রধান। কেউ কোন জবাব দিল না। বিশাল হলঘর জুড়ে নেমে এল অস্বস্তিকর নিরবতা।

মীটিং থেকে বাপ-ব্যাটা দু'জনে চলে এল তরুর কাছে। সেই একইভাবে নিশ্চল শুয়ে আছে মেয়েটা, শূন্য দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। বুক পর্যন্ত সাদা চাদর ঢাকা। ভারী প্লাস্টিকের পর্দায় হাত রাখলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'কি রে, মা! ব্যথা একটু কমেছে নতুন ওষুধটা দেবার পর?'

'মনে হয়,' তরুর কণ্ঠস্বর ওর চোখের মতই নিষ্প্রাণ।

'শোন্, মা, একটা নতুন চিকিৎসা আমরা পরীক্ষা করব...'

'না, বাবা! আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না তোমরা। কোন লাভ নেই।'

'অমন বলে না, মা! তুই ভাল হয়ে যাবি, দেখিস্। আমরা সিগন্যালটা রিভার্স করে তোকে শোনাব। মনে হয় তাতে কাজ হতেও পারে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। যে শব্দের আবহ এই রোগ সৃষ্টি করেছে, তা উল্টো করে বাজালে রোগের সিম্পটমগুলো চলেও যেতে পারে।'

'না, বাবা, প্লিজ!' ফুঁপিয়ে উঠল তরু। 'আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না! আমার মিউজিকটা কেন কেড়ে নিলে তোমরা? ওটা শুনতে পেলেই আমি ভাল হয়ে যেতাম।'

'পাগলামি করে না, মা! ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি আর তোর ভাইয়া ঠিক তোর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকব। কিচ্ছু ভাবিস্ না।'

নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল তরু। বাঁ হাতের পিঠে নিজের চোখের কোলের দু'ফোঁটা অশ্রু মুছে নিলেন সালাহ্ উদ্দীন। তারপর ইঙ্গিতে তাহ্মীদকে শুরু করতে নির্দেশ দিলেন।

বাড়ি থেকে সকালেই ক্যাসেট প্লেয়ারটা নিয়ে এসেছিল তাহ্মীদ। একটা ক্যাসেটে সিগন্যালটা উল্টো করে টেপ করে দিয়েছেন ড. দোহা। সেটা প্লে করে দিল সে। উল্টো-সোজা কিছু অবশ্য বোঝা গেল না, সেই একইরকম ভৌতিক গুমগুম শব্দে ভরে গেল ঘর। সঙ্গে সঙ্গে তাহ্মীদ আর সালাহ্ উদ্দীনের উৎকণ্ঠিত চোখের সামনে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল তরু, সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো চীৎকার। 'ও মা গো! আমি মরে গেলাম···বাবা···বন্ধ করে দাও ওটা···ও ভাইয়া রে···'

বিচলিত হলো তাহ্মীদ, ওকে শক্ত করে ধরে রাখলেন সালাহ্ উদ্দীন। একজন নার্স মনিটরে তরুর ভাইটাল সাইনের দিকে লক্ষ্য রাখছে। দশ সেকেন্ড পর ভল্যুমটা একটু বাড়িয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল তরু। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে! লাফিয়ে উঠল নার্স, 'স্যার! হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে!'

ঝট্ করে প্লাস্টিকের পর্দাটা সরিয়ে মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সালাহ্ উদ্দীন। আর সহ্য করতে পারল না তাহ্মীদ। পিছু হটে পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল করিডরের শেষে ডাক্তারের অফিসের উদ্দেশে। অফিসের এক কোণে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে ছেড়ে রাখা বাবার ল্যাবকোট। ছোঁ মেরে ল্যাবকোটের

পকেট থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল তাহ্‌মীদ, আবার দৌড়াল ফিরতি পথে। এই ক্যাসেটে আছে আসল সিগন্যালের অবিকৃত কপি।

তরুর বেডের চারপাশে ব্যস্তসমস্ত একদল ডাক্তার, পাগলের মত মেয়ের হার্ট ম্যাসাজ করছেন সালাহ্‌ উদ্দীন। তাহ্‌মীদকে কেউ লক্ষ্য করল না। ছুটে গিয়ে প্লেয়ারের ক্যাসেট বদলে দিল সে। সেই একইভাবে গুমগুম করে বাজতে শুরু করল আসল সিগন্যালটা। রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, 'কি করছিস! বন্ধ কর ওটা!'

'না, বাবা। ও বারবার বলছিল মিউজিকটা শুনতে পেলে ভাল হয়ে যাবে।'

তরুর নাকে অক্সিজেন মাস্ক চেপে ধরে ছিল নার্স, প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'স্যার, শ্বাস নিচ্ছে! ও শ্বাস নিচ্ছে!' মনিটরের ভয়াবহ সরলরেখাটা আবার স্বাভাবিকভাবে ওঠানামা শুরু করেছে।

বিহ্বলের মত তাহ্‌মীদের দিকে চেয়ে রইলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, হাঁপাচ্ছেন ঘন ঘন।

'বাবা, দেখলে তো, এই পরিবর্তনটাকে আমরা বাধা দিতে পারব না। যা হবার, তা হবেই,' বলল তাহ্‌মীদ।

'হবে? কি হবে?' হতভম্বের মত প্রশ্ন কবলেন সালাহ্‌ উদ্দীন।

ওদিকে নড়েচড়ে উঠে চোখ খুলে সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়েছে তরু, ম্লান হাসি ওর কালচে ঠোঁটে। 'কি রে, ভাইয়া, তুই এ ক'দিন শেভ করিস্‌নি কেন?'

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, 'তুই দেখতে পাচ্ছিস্‌, মা?'

'হ্যাঁ, বাবা। আর কোন যন্ত্রণা নেই আমার। এত ভাল লাগছে!' ক্লান্তিতে চোখ বুজল তরু, 'আহ্‌! আমি এখন তৈরি!'

'তৈরি!' অবাক হয়ে তাহ্‌মীদের দিকে ফিরলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, 'কিসের জন্যে তৈরি?'

কোন কথা না বলে পাশ ফিরে শুলো তরু, ঘুমিয়ে পড়ল। সারা শরীরে ছোপ ছোপ ঘা চকচক করছে।

টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিলুফার এসে হাজির হলেন এসময়। বাপ-ব্যাটাকে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চঞ্চল হলেন, ফ্যাকাসে মুখে থমকে দাঁড়ালেন দরজায়। 'তরু···কেমন আছে···'

ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল তাহ্‌মীদ, হাসতে হাসতে বলল, 'ও ভাল আছে, মা! ওর ব্যথা সেরে গেছে। আর কোন চিন্তা নেই, দেখো তোমরা।'

ধীরে ধীরে হলেও ঘা ছড়িয়ে পড়ছে তাহ্‌মীদের সারা শরীরে। কিন্তু যন্ত্রণা তেমন নেই, শুধু চামড়ার তলায় মৃদু অস্বস্তি। ক্যাসেটটা যখন শুনতে থাকে, অনির্বচনীয় ভাল লাগায় ভাসতে থাকে দেহমন। হাসপাতালের দোতলায় একটা সাময়িক গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেখানে রাতদিন রোগীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তাহ্‌মীদ এখানেই থাকে বেশীরভাগ সময়, বাড়িমুখো হয় না বড় একটা। নিলুফার টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে আসেন, ক্যাফেটেরিয়ার চা-সিঙ্গাড়া মিলে চলে যায় ভালই। গবেষণাগারের একধারে তাহ্‌মীদ্ নিজের মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, কেউ বড় একটা নজর দেয় না।

পরদিন দুপুরে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে ডা. হুসনা বানুর অফিসে হাজির হলো তাহ্‌মীদ। ওখানে এককোণে একটা ইজিচেয়ার রাখা আছে। তরুর দেখাশোনার ফাঁকে ফাঁকে তাতে একটু গড়িয়ে নেন সালাহ্ উদ্দীন, জানে তাহ্‌মীদ।

'এসো, তাহ্‌মীদ,' হাতে ধরা রিপোর্ট থেকে চোখ তুলে তাকালেন ডা. বানু। কেমন আছ আজ?'

ইজিচেয়ার থেকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন সালাহ্ উদ্দীন, জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

'আমি মনে হয় বুঝতে পারছি কেন এমন হচ্ছে,' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল তাহ্‌মীদ।

রিপোর্টটা হাত থেকে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন ডা. বানু। 'সারা পৃথিবী জুড়ে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী গত চার/পাঁচদিন ধরে অক্লান্ত খেটেও নতুন কিছুই জানতে পারেনি। তুমি...'

'ওরা যে আমার মত শুনতে পায় না, আপা! যত শুনছি ততই ভাল লাগছে আমার। বলে বোঝাতে পারব না কি অপূর্ব মূর্ছনা লুকিয়ে আছে ওতে! তরুর মত আমিও মোহিত হয়ে পড়ছি ধীরে ধীরে, কি যে

আনন্দ...'

'তাহ্‌মীদ!' প্রায় ধমকে উঠলেন সালাহ্‌ উদ্দীন। 'একবার আয়নায় নিজেকে দ্যাখ্‌। মুখে আর গলায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ওটা। ক্যাসেট শোনা বন্ধ কর্‌, নাহলে তরুর মত...' বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি।

'বাবা, ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা কর্‌। এ পর্যন্ত দু'জন রোগী মারা গেছে, কারণ ওদেরকে সিগন্যালটা শুনতে না দিয়ে ওদের চিকিৎসা করতে গিয়েছিলে তোমরা। সেজন্যেই মরেছে ওরা। কারণ ওদেরকে শুনতে দাওনি।' কোন উত্তর দিলেন না সালাহ্‌ উদ্দীন, শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডা. বানুর দিকে চাইলেন একবার। একটু অপেক্ষা করে আবার বলতে শুরু করল তাহ্‌মীদ। 'সিগন্যালটা আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে না, বাবা। ওটা শুধু আমাদেরকে বদলে দিতে চাইছে। এটা কোন অজানা রোগ নয়, আসলে আমরা বদলে যাচ্ছি।'

'কি বলছিস্‌ এসব!'

'আমি ঠিকই বলছি, বাবা। যত শুনছি ততই পরিষ্কার হয়ে আসছে সব রহস্য। সিগন্যালটা আমাদের ক্ষতি করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে না, ওরা শুধু আমাদের বদলে দিতে চাইছে। তোমাদের বোঝাতে পারব না কি যাদু আছে ওই সুরে!'

'তাহ্‌মীদ,' বাধা দিলেন ডা. বানু, 'এটা এনডোরফিনের প্রভাব, ড্রাগের মত...'

'না, আপা। পরিবর্তনটা যাতে শারীরিক কষ্ট ছাড়াই ঘটে, সেজন্যেই শুধু ড্রাগ এফেক্টটা হচ্ছে। ঘোরের মধ্যে ব্যথাটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা, মনে করে দেখো, তরু বলছিল ও তৈরি। তার মানে অবচেতন মনে ও সত্যিই বুঝতে পারছিল ও পরিবর্তনের জন্যে তৈরি হয়ে গেছে।'

'পরিবর্তন!' অস্ফুটে বলে উঠলেন সালাহ্‌ উদ্দীন, 'কিসের পরিবর্তন?'

'গত কয়েকদিন ধরে সেটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। আমাদের বাড়ির টবের গাছগুলোকে সব ল্যাবে নিয়ে এসেছিলাম। ওগুলোকে সব খুব শক্তিশালী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির নিচে রেখে দিয়েছিলাম গত কয়েকদিন ধরে। গাছপালা-মানুষ সবার জন্যেই ওই লেভেলের রে

মারাত্মক ক্ষতিকর। তারমধ্যে অর্ধেক টব আলাদা করে ফেলেছিলাম, সেগুলোকে ক্যাসেটের মিউজিক শুনিয়েছি একইসঙ্গে। অবাক ব্যাপার কি জানো, বাবা, যে গাছগুলো মিউজিক শুনেছে, আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি ওদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। দিব্যি ভাল আছে তারা, শুধু পাতার গায়ে গায়ে কেমন যেন স্বচ্ছ একটা আবরণ পড়ে গেছে। যে গাছগুলো মিউজিক শুনতে পায়নি, তারা সব মরমর। শুকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।'

সবাইকে চমকে দিয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকালেন সালাহ্ উদ্দীন, 'হ্যালো!'

'ডক্টর সালাহ্ উদ্দীন?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ।

'জ্বী, বলছি।'

'আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সামসুদ্দোহা বলছি।'

'ও হ্যাঁ, ড. দোহা! কি খবর···সব ভাল তো!'

'আপনি তাহ্মীদকে নিয়ে একটু আসতে পারবেন? আমি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে আছি। তাহ্মীদ চেনে। দেরি করবেন না, প্লিজ!'

'কি ব্যাপার বলুন তো? কোন বিপদ···'

'না না, ভয়ের কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে তাহ্মীদের কৌতূহলী চোখে চোখ রাখলেন তিনি, 'এক্ষুনি একবার তোদের ডিপার্টমেন্টে যেতে হবে।'

পাঁচ

ড. দোহা অস্থির পায়ে পায়চারি করছিলেন বারান্দায়। ওদেরকে দেখতে পেয়েই প্রায় দৌড়ে এলেন, 'এই যে···এসে গেছেন আপনারা। তাহ্মীদ, তোমার কথাই ঠিক। যা সন্দেহ করেছিলে, তাই হয়েছে।' দ্রুতপায়ে ল্যাবে এসে ঢুকলেন তিনি, বাপ-ব্যাটা অনুসরণ করছে তাঁকে।

'ব্যাপারটা কি, বলুন তো?' সন্দিহান দৃষ্টি সালাহ্ উদ্দীনের চোখে।

'এই দেখুন! নীল বামন, মানে ব্লু ডুয়ার্ফ!' ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলেন একটা মনিটরের দিকে। মহাকাশের একটা ছবি দেখা যাচ্ছে তাতে, মাঝখানে সূর্য, চারধারে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল কিছু তারা। কালো আকাশ।

'নীল বামন! মানে?' বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলেন সালাহ্ উদ্দীন মনিটরের দিকে।

'ব্লু ডুয়ার্ফ আমাদের মতই অন্য একটা সোলার সিস্টেম, কোটি কোটি মাইল দূরে,' সম্মোহিতের মত মনিটরের দিকে চেয়ে আছে তাহ্মীদ, 'রেডিও সিগন্যালটা ওদিক থেকেই নামছিল।'

'ঠিক তাই,' খুশিয়াল গলায় সায় দিলেন ড. দোহা, কী-বোর্ডের উপর নেচে বেড়াচ্ছে দু'হাতের আঙুলগুলো। 'তোমার কথাগুলো বারবার মনে হচ্ছিল। তাই ব্লু ডুয়ার্ফের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম, সিগন্যালটা ওখান থেকেই তো পাঠানো হচ্ছে। ব্লু ডুয়ার্ফ আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য গত কয়েকদিন ধরে ডাউনলোড করছিলাম। কি আবিষ্কার করলাম, জানো? এই দ্যাখো!' তর্জনীতে খট করে একটা কি চাপ দিতেই পাশের আর একটা মনিটরে ব্লু ডুয়ার্ফের মত আঁর একটা ছবি ভেসে উঠল, 'এটাও ব্লু ডুয়ার্ফ। হাব্‌ল্ টেলিস্কোপে এই ছবি তোলা হয়েছে ঠিক আটাশ দিন আগে। আর ওপাশের ছবিটা তোলা হয়েছে উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে। দুটো ছবির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?'

লাফিয়ে উঠল তাহ্মীদ, 'স্যার...সূর্যের রং বদলে গেছে! উজ্জ্বল হয়ে গেছে আরও...স্যার! ওদের সূর্যটা বদলে গেছে!'

'ঠিক বদলায়নি, আলট্রা ভায়োলেটের দিকে একটু সরে এসেছে শুধু, সেজন্যেই রঙটা বদলে গেছে।'

'স্যার,' নিজের অজান্তেই ড. দোহার কাঁধ চেপে ধরল তাহ্মীদ; 'তারমানে আমাদের সূর্যটাও আলট্রা ভায়োলেটের দিকে সরে যাচ্ছে!'

অসহায়ের মত হাসলেন ড. দোহা, 'ঠিক তাই। গত কয়েকদিন ধরে সোলার অ্যাকটিভিটি এত বেড়ে গিয়েছিল, তারপরেও আমরা কোন নজর দিইনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সালাহ্ উদ্দীন, 'অথচ ওরা ঠিকই নজর রেখেছে। তাই না?'

'আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ওরা নিজেদেরকে বদলে ফেলেছে। নাহলে ওরা ধ্বংস হয়ে যেত। ওরা ঠিকই লক্ষ্য করেছে যে আমাদের সোলার সিসটেমেও সেই একই দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে। সানস্পটে যে অস্বাভাবিক সোলার অ্যাকটিভিটি দেখা যাচ্ছে, সেটা হলো ওয়ার্নিং। আলট্রা ভায়োলেটের হাত থেকে বাঁচার মত কোন উপায় ভেবে বের করতে না পারলে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে প্রাণের সব চিহ্ন।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. দোহা।

'সেজন্যেই ওরা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসেছে,' ম্লান হাসল তাহ্মীদ। 'সিগন্যালটা ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে পাঠায়নি, পাঠিয়েছে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে। ওরা আমাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছে।'

ঠিক তিনদিন পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। '...আমাদের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। যদিও এখনও খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে সূর্যের অক্ষরেখা ধীরে ধীরে অতি-বেগুনী রশ্মির দিকে সরে যাচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার খাতিরে অবশ্যম্ভাবী শারীরিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সরকার অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনীয় হরমোন চিকিৎসা দু'দিনের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে শুরু হয়ে যাবে। এছাড়া সকল নাগরিককে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা মহাকাশ-সঙ্গীত শুনুন, বিশেষ করে যাদের বয়স একুশ বছরের নিচে। সরকার জরুরী ভিত্তিতে প্রতিরক্ষামূলক সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে, জনসাধারণের সহযোগিতাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি কাম্য। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।'

রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় স্পিকারে মহাকাশ-সঙ্গীত নামে পরিচিত অদ্ভুত আবহ বাজতে থাকল উঁচু পর্দায়। রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেটে, ঘোষণা এবং

খবরের সময়টুকু ছাড়া, সর্বক্ষণ মহাকাশ-সঙ্গীত প্রচার হতে লাগল। জনসাধারণ প্রথমে আতঙ্কিত, তারপর সন্দিহান এবং সবশেষে বিহ্বল অবস্থায় এই জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করল। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যান্য সব দেশেও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সপ্তা দুয়েকের মধ্যেই প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গেলে সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে গেল। শুধু বদলে গেল জীবনযাত্রার প্রণালী। জি-সেভেন দেশগুলো এগিয়ে এল প্রতিরক্ষাকাজে দরিদ্র দেশগুলোর সহযোগিতায়। জরুরী ভিত্তিতে অরবিটে স্যাটেলাইট প্রেরণ করা হলো যা সর্বক্ষণ মাইক্রো-ওয়েভে মহাকাশ-সঙ্গীত ট্রান্সমিট করবে। আধুনিক টেকনোলজির সংস্পর্শহীন পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এভাবেই রক্ষা করা হলো। এসব দেশগুলোকে বিনামূল্যে হরমোন এবং প্রয়োজনীয় টেকনোলজি সরবরাহ করার জন্যে এগিয়ে এল ধনী দেশগুলো।

ঠিক ছ'মাস পরের কথা। বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল তরু। তাহ্‌মীদের সঙ্গে নিউমার্কেটে যাবে, দু'জনেরই টুকটাক কেনাকাটা আছে। ছুটির দিন, দুপুর ঠিক দুটো। কিন্তু ঘরে শক্তিশালী আলো জ্বলছে, জানালায় ভারী পর্দা টানা।

স্যানডেল পায়ে গলিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল তরু, হালকা গোলাপী সালোয়ার কামিজ পরেছে আজ। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ আনমনে, তারপর লম্বা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মানুষ অভ্যাসের দাস, কথাটা যে এত সত্যি, তা কি আগে জানতাম?'

'কি বললি?' জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে মুখ তুলে তাকাল তাহ্‌মীদ।

'না...মানে বলছিলাম, কোন দরকার নেই জানি, তারপরেও অভ্যাসের বশে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে ঠিকই একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াই।' আয়নায় এখনও অনভ্যস্ত, নিজের প্রায় অপরিচিত প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আছে তরু। সবুজ আভা ছড়ানো স্বচ্ছ চকচকে নিভাঁজ ত্বক, মাথায় বা শরীরের কোথাও চুলের চিহ্নমাত্র

নেই। পাপড়িহীন চোখের মণি উজ্জ্বল সোনালী। আয়নার নিচের দেরাজ থেকে একটা চুলের ব্যান্ড তুলে নিল তরু, ম্লান হাসল, 'এত শখ করে এই ব্যান্ডটা কিনেছিলাম! অথচ একবারও পরতে পারলাম না।' প্রয়োজন নেই বলে ড্রেসিং টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখা লোশনক্রীম ইত্যাদি টুকিটাকি প্রসাধনী বহু আগেই ফেলে দিয়েছে তরু, কিন্তু বহু শখের চুলের এই ব্যান্ডটা এখনও কেন যেন রেখে দিয়েছে। আনমনে চুলবিহীন মাথায় হাত বুলাল তরু, 'নিজেকে এখনও আমার অপরিচিত মনে হয়। প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠি, কে ওই মেয়েটা?'

'তুই যে কেন এখনও এত মন খারাপ করিস্!' উঠে এসে তরুর পাশে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াল তাহ্মীদ। সবজেটে স্বচ্ছ ত্বকে ভাঁজ ফেলে হাসল, 'আমার তো মনে হয় এটা ভালই হয়েছে। কেউ ফর্সা কেউ কালো রইল না। মেঘের মত চুল পটলচেরা চোখের আর কোন অর্থ রইল না। সবাই সমান হয়ে গেল। এটাই তো ভাল।'

বারো বছরের মন্টু মিয়া দরজায় এসে দাঁড়াল, চকচকে ন্যাড়া মাথার স্বচ্ছ ত্বকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আফা, মিলি আফায় আইছে।' বলতে বলতেই মিলি এসে দাঁড়াল দরজায়, জিন্স্ আর পাতলা একটা সোয়েটার পরনে। পান্নারঙা গলা ঘিরে থাকা সোনার পাতলা চেন, মিলির চোখের সোনালী মণির সঙ্গে ভারি মানিয়েছে। 'তোরা কি কোথাও যাচ্ছিস নাকি?'

'দূরে কোথাও নয়, নিউমার্কেটে। তুইও চল আমাদের সঙ্গে।' মিলিকে পেয়ে খুশি হলো তরু।

দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'কে, মিলি নাকি? ভাল আছ বেটি?'

'জ্বী, চাচা।' মাথা হেলাল মিলি।

'আরে, তরু মা, তুই তো জমজমাট একটা সালোয়ার কামিজ পরেছিস! ঠিক গোলাপ ফুলের মত দেখাচ্ছে তোকে!' হৈ-হৈ করে উঠলেন সালাহ্ উদ্দীন।

'কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দাও, বাবা! আমি জানি তোমার কাছে কি অদ্ভুত বিতিকিচ্ছিরি দেখায় আমাদেরকে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগটা

কাঁধে ঝুলিয়ে নিল তরু।

'কি যে বলিস্!' এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন সালাহ্ উদ্দীন, কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা সবাই তো এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। এযে জীবন-মরণের ব্যাপার। আমাদের কাছে তোরা সবসময়ই সুন্দর থাকবি।'

'তাহলে তুমি কেন এই পরিবর্তনে যোগ দিলে না, বাবা?' বিষণ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল তাহ্মীদ।

আনমনে গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলালেন সালাহ্ উদ্দীন। পৃথিবীর আরও অনেকের মত তিনি এবং নিলুফার পরিবর্তনে যোগ দেননি, প্রয়োজনীয় হরমোন ট্রিটমেন্ট তাঁরা গ্রহণ করেননি। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্যে মহাকাশ-সঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে হরমোন চিকিৎসার আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তবে পূর্ণবয়স্কদের জন্যে এটা বাধ্যতামূলক নয়। 'তোর মা যে চাইল না! তবে আমিও ওর সঙ্গে একমত। আমাদের জীবন তো প্রায় শেষের পথে। অসুবিধের মধ্যে এই যে বাকি জীবন আমরা সূর্যের আলো আর দেখতে পাব না, দিনের বেলায় আর বাইরে বের হতে পারব না, এই তো! কিন্তু তোদের তো অন্ধকার ঘরে বসে থাকলে চলবে না, সারা জীবনটাই পড়ে আছে সামনে।'

'তোমার কষ্ট হয় না, বাবা?'

হাসলেন সালাহ্ উদ্দীন, 'না রে! কিসের কষ্ট? শুধু রুটিনটা বদলে গেছে। তাছাড়া আমাদের বয়েসী বেশীরভাগ লোকই তো পরিবর্তনে যোগ দেয়নি। তোদেরকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না আমাদের বুড়োদের মনের কথা। আমরা প্রাচীনপন্থী, অতীতেই আমাদের বাস। তোরা নতুন দিনের পথিক, ভবিষ্যৎ তো তোদেরকেই গড়তে হবে। আমাদের কথা ভেবে মন খারাপ করিস্ না।'

খুব নীচু গলায় তরু বলল, 'কিন্তু বাবা, সেই মহাকাশ-সঙ্গীতের কিছুই তুমি শুনতে পেলে না! সে যে কি অনুভূতি...কি আনন্দ...'

কৃত্রিম আঁৎকে উঠার ভঙ্গি করে জোরে হেসে ফেললেন সালাহ্ উদ্দীন, 'না বাবা, ওই সঙ্গীত শুনে আমার কাজ নেই। শচীনদেব আর হেমন্তই আমার ভাল। তোরা তার কি বুঝবি?'

হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দিবানিদ্রার আশা বাদ দিয়ে নিলুফারও বেরিয়ে এলেন শোবার ঘর থেকে, 'কি ব্যাপার, খুশি দেখি আর ধরে না!'

তরু মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল, 'বাবা তো খুশি হবেই আম্মা, এখন থেকে রাতদিন যে তোমাকে কাছে পাবে।'

'খুশি না হাতি। রাতদিন খিটিমিটি করে আমার চুল পাকিয়ে দেবে অকালে।'

হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ল নিউমার্কেটের উদ্দেশে। জানালার ভারী পর্দা একটুখানি ফাঁক করে সতৃষ্ণ চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন নিলুফার। সূর্যের হালকা বেগুনী আভাযুক্ত রশ্মি কেমন অবলীলায় পিছলে পড়ছে তাহ্‌মীদ, তরু আর মিলির উজ্জ্বল মসৃণ উন্মুক্ত ত্বকে। কেমন সতেজ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা! নির্বিকার, নির্ভয়।

সাজা

এক

রক্তলাল চোখ দুটো জ্বলন্ত কয়লার মত ধিকিধিকি জ্বলছে। হাতে হাতকড়া, পরনে জেলখানার সাদা-কালো ডোরাকাটা কয়েদীর পোশাক। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত খুনের আসামী আমজাদ খাঁ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোহার শিক ঘেরা করিডর ধরে। দুপা শিকলে বাঁধা থাকার কারণে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। ওর ঠিক পিছনেই আছে ইউনিফর্ম পরা জেল-গার্ড, হাতের রুল দিয়ে মাঝে মাঝেই গুঁতো দিচ্ছে আমজাদ খাঁর পেশীবহুল পিঠে। ভীত পায়ে এদের দু'জনকে অনুসরণ করছেন ডা. জিনাত হায়দার। শরীরের নয়, ইনি মনের ডাক্তার। ঢাকা মানসিক চিকিৎসা এবং গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান। ভয়ঙ্কর অপরাধীদের মানসিক গঠন পরীক্ষার ব্যাপারে সরকারী পক্ষ থেকে প্রায়ই ডা. জিনাত হায়দারের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে।

মানসিক রোগীদের নিয়েই তাঁর কাজকারবার, হয়তো সেজন্যেই মানসিকভাবে সুস্থ এই খুনীকে প্রচণ্ড ভয় করছে। বার বার পিছু ফিরে ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আমজাদ খাঁ, ভয়ে রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। কাঁচাপাকা চুলের পাশ দিয়ে একফোঁটা ঘাম নেমে এল কপাল বেয়ে, কাঁপা কাঁপা হাতে মুছে নিলেন ডা. জিনাত। প্রচণ্ড নার্ভাস লাগছে।

একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়াল গার্ড। ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে দরজা খুলল। বেশ জোরেশোরেই রুলের খোঁচা দিল আমজাদ খাঁর পিঠে। হুড়মুড়িয়ে সেলে ঢুকে গেল আমজাদ খাঁ। প্রচণ্ড ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তারপরেও সেলে ঢুকলেন ডা. জিনাত। ইশারায় গার্ডকে চলে যেতে বললেন। আমজাদ খাঁর কালচে ঠোঁট দুটোয় দুর্বোধ্য হাসি। হলদেটে ম্লান আলোয় বীভৎস দেখাচ্ছে ন্যাড়া মাথাটা।

ঘড়ঘড় শব্দে বন্ধ হয়ে গেল সেলের দরজা। ডা. জিনাত এই

মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন আমজাদ খাঁর মুখোমুখি, সম্পূর্ণ একা! অসুস্থ বোধ করলেন তিনি। হঠাৎ করেই কেন যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে অর্থহীন মনে হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর খুনীর সামনে কেন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি?

কালচে ঠোঁটের ফাঁকে হলদেটে দাঁতের সারি উঁকি দিল, হাসছে আমজাদ খাঁ! গোল গোল চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। এগিয়ে আসছে খুনীটা! হায় আল্লাহ্!

নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেলেন জিনাত। পিঠে শীতল লোহার শিকের স্পর্শে শিউরে উঠলেন। হাতকড়া পরা হাত দুটো এগিয়ে আসছে অমোঘ নিয়তির মত! আমজাদ খাঁর সারা মুখাবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঘিনঘিনে হাসি।

চোখ বুজে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন ডা. জিনাত।

'জিনাত আপা, চোখ খুলুন! এই যে, আমার দিকে তাকান!' মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে এল কোন সুদূর থেকে!

উদ্গত চীৎকারটা কোনভাবেই থামাতে পারছেন না জিনাত। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন। চোখে চোখে চেয়ে আছে উদ্বেগমাখা একজোড়া সুন্দর চোখ, মসৃণ গালের দুধার দিয়ে নেমে এসেছে থোকা থোকা ঢেউ খেলানো লম্বা চুল। বড় পরিচিত মুখটা। কে যেন এই মেয়েটা? ও তাই তো, এ যে সাবরিনা! বিজ্ঞানী ড. নাসিম হারুনের সহকারী! মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলেন জিনাত। মনে পড়ে গেল সবকিছু।

বিমূঢ় চোখে চারদিকে চাইলেন। সাবরিনার পিছনেই বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নাসিম হারুন। ধবধবে সাদা ল্যাবকোট গায়ে, হাসি হাসি মুখ। পাশেই সাফারি-সুট পরা মন্ত্রী, চোখে ঘন উদ্বেগ।

মন্ত্রী নাজমুল হুদা এগিয়ে এসে দ্রুতহাতে জিনাতের মাথায় পরানো হেডসেটটা খুলে নিলেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো, ম্যাডাম?'

চামড়ামোড়া উঁচু চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন জিনাত। বোকার মত চেয়ে আছেন, আতঙ্কটা কিছুতেই কাটছে না! হঠাৎ করে কি যেন মনে পড়তেই ঘুরে তাকালেন ঘরের অন্য প্রান্তে। ওই তো

আমজাদ খাঁ। ঠিক একইরকম দেখতে আর একটা উঁচু চেয়ারে স্ট্র্যাপবাঁধা অবস্থায় বসে আছে! মাথায় হেডসেট, অদৃশ্য বৈদ্যুতিক সিগন্যাল সরাসরি প্রবেশ করছে ওর মস্তিষ্কে। আমজাদ খাঁর চোখে আতঙ্কমাখা বিহ্বল দৃষ্টি। ঘোরের মধ্যে আছে। এ জগতে নয়, অবাস্তব এক পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে এ মুহূর্তে।

'আশ্চর্য!' ভাঙা গলায় বলে উঠলেন জিনাত, 'বাস্তবের মতই সত্যি মনে হচ্ছিল! আগে থেকে জানা সত্ত্বেও একদম বুঝতে পারিনি! কেন আমাকে এতক্ষণ ধরে ওখানে রেখে দিয়েছিলেন আপনারা?' প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি।

'মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্যে প্রোগ্রামটা অ্যাকটিভেট করা হয়েছিল,' স্ট্র্যাপগুলো খুলতে খুলতে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল সাবরিনা।

'মাত্র তিন সেকেন্ড! অথচ মনে হচ্ছিল যেন কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে!' জিনাতের কণ্ঠে এখনও ভয়ের রেশ।

এগিয়ে এল নাসিম হারুন, এই বিশেষ প্রোগ্রামের আবিষ্কর্তা। 'সময়কে জয় করাই এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। আশাকরি আপনি বুঝতে পেরেছেন, ম্যাডাম, প্রোগ্রামটা কত কার্যকরী।'

এখনও বিহ্বল দেখাচ্ছে জিনাতকে। 'আশ্চর্য! কি ভীষণ রকম বাস্তব!'

বিজয়ীর মত মাথা উঁচু করল নাসিম, 'এক অর্থে এটা তো বাস্তবই।' অর্থপূর্ণ চোখে চাইল ডা. জিনাত আর মন্ত্রী নাজমুল হুদার দিকে, 'স্বাগতম! বিচার-ব্যবস্থার নতুন যুগে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি!'

আমজাদ খাঁ সেই একইভাবে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শূন্যে। স্ট্র্যাপে বাঁধা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দ্রুতপায়ে একটা মনিটরের সামনে এসে দাঁড়াল নাসিম। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তীর মত। প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই তরুণ বিজ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থদের পিছনে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের আপনভোলা বলে যে একটা বদনাম আছে, নাসিম হারুনের সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। আধুনিক ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা চুল, ক্লীন শেভ্‌ড্, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের

সঙ্গে মানানসই দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ। সবসময়ই ফিটফাট। 'মাত্র তিন সেকেন্ডের জন্যে আপনি আমজাদ খাঁর সঙ্গে ছিলেন, ম্যাডাম। বলতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবেই আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন বলুন, প্রোগ্রামটা কতটুকু এফিশিয়েন্ট!'

'কি ভীষণ বাস্তব!' ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে নেমে এলেন জিনাত, আড়চোখে তাকালেন আমজাদ খাঁর দিকে। 'মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই আমি ওই বদমাশটার সঙ্গে জেলখানায় আছি!'

'এগজ্যাক্টলি মাই পয়েন্ট,' খুশিয়াল গলায় বলল নাসিম। হাতের আঙুলগুলো দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী-বোর্ডে, মনিটরে চোখ। 'আমজাদ খাঁ কিন্তু এই মুহূর্তে ভাবছে যে সে তার পঁচিশ বছরের সাজা ভোগ করছে। মাত্র ত্রিশ মিনিট আগে প্রোগ্রামটা চালু করেছি, কিন্তু জেলের মধ্যে আমজাদ খাঁ এরমধ্যেই কয়েক দিন কাটিয়ে দিয়েছে মনে মনে। এস.পি.আর মস্তিষ্কের সময়ের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।'

সাবরিনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, বলল, 'আসামী চেয়ারে বসে থাকবে এক ঘণ্টা, কিন্তু মনে করবে কেটে গেছে বহু বছর।'

মন্ত্রী নাজমুল হুদা চিন্তিত ভঙ্গিতে গালে হাত বুলালেন, 'ডা. জিনাতের বেলায় তিন সেকেন্ডের মাথায় যদি প্রোগ্রামটা প্রত্যাহার করা না হত, তাহলে কি হত?'

মৃদু হাসল নাসিম। 'তাহলে উনিও আমজাদ খাঁর সঙ্গে পঁচিশ বছরের সাজা ভোগ করতেন। দেড় মিনিট পরে আর প্রোগ্রামটা প্রত্যাহার করা যায় না।'

'দেড় মিনিটের মধ্যে এত সময় কেটে যায় যে এর পরে প্রোগাম প্রত্যাহার করার উপায় থাকে না, ওই সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের নিউরনগুলো পুরোপুরি অ্যাডজাস্টেড হয়ে যায়,' যোগ করল সাবরিনা।

নাজমুল হুদাকে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'তার মানে একবার প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেলে তা আর থামানোর উপায় নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক কারণেই আসামীর সাজার সময়সীমা কমিয়ে দেয়া হয়, এখানে তা করা যাবে না!'

নাসিমের দু'ভুরুর মাঝে সূক্ষ্ম একটা ভাঁজ পড়ল। 'সাজা কমানোর দরকার কি? অপরাধ করেছে, তার শাস্তি ওরা পাচ্ছে। সত্যি সত্যি তো

আর সময়টা ওরা খরচ করছে না!'

'আজকাল আমরা অপরাধীদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি ডা. জিনাত জানেন এ ধরনের চিকিৎসা এদের জন্যে কতটা উপকারী। আমরা চাই এই দাগী-আসামীরা যখন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন তারা হবে ভিন্ন মানুষ। আপনার এই এস.পি.আর প্রোগ্রামে সেই মানসিক চিকিৎসার সুযোগ কোথায়? একবার প্রোগ্রাম চলতে শুরু করলে সেটা তো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।'

আবার হাসি ফিরে এল নাসিমের ঠোঁটের কোণে। 'মানসিক চিকিৎসার সবরকম পদ্ধতিই এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। সাজা ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের রিহ্যাবিলিটেশনও হবে। প্রোগ্রাম শেষে দাগী-আসামীরা পরিণত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে। প্রতিহিংসা, হিংস্র আচার-আচরণ, বিদ্বেষ—এসব কিছুই তারা ভুলে যাবে উপযুক্ত চিকিৎসায়। উপরন্তু যখন ওরা আবিষ্কার করবে যে সত্যি সত্যিই বছরের পর বছর ওদের নষ্ট হয়নি গরাদের পিছনে, সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়বে। ক'টা লোক দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় ভুল শোধরাবার?'

'নাসিম সাহেব, পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অমানবিক ব্যাপার আছে। চিন্তা করে দেখুন, ক্রিমিনাল হলেও এরা তো মানুষ! অনুমতি ছাড়াই এদের উপর এমন একটা ব্যাপার চাপিয়ে দেয়া কি উচিত? ওরা মনে করবে যে শাস্তি ভোগ করছে বছরের পর বছর, অথচ এক সময় আবিষ্কার করবে আসলে কেটেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তখন মনের অবস্থাটা কেমন হবে?'

'বললাম তো, স্যার, দ্বিতীয়বার জীবনটা ফিরে পাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা পোষণ করবে, আর কিছু নয়।' একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল নাসিম, 'সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গত আট বছর ধরে এই প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করছি আমি। আমাকে বলা হয়েছিল সরকারী ব্যয় সংকোচের লক্ষ্যে কিছু নতুন টেকনোলজি উদ্ভাবন করতে। আজ আমি সফল। দেশের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কারাগারগুলোর অবস্থা চিন্তা করে দেখুন, স্যার, বাজেট-সংকোচনের কারণে কি দুরবস্থা সেগুলোর! দিন দিন অপরাধীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, নতুন কারাগার তৈরি করার সঙ্গতি নেই সরকারের। প্রতিটা কারাগারে আসামীর সংখ্যা

ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। দীর্ঘদিন ধরে এদের খাওয়া-পরা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও খরচ হয় জনসাধারণের দেয়া ট্যাক্সের বিরাট একটা অংশ। এছাড়াও আছে সিকিউরিটি ব্যবস্থার খরচ। চিন্তা করে দেখুন, এই এস.পি.আর সিস্টেম প্রতিবছর সরকারী ব্যয় কতটা কমিয়ে আনবে। আসামী প্রয়োজনমত সাজা পেয়ে গেল, অথচ সরকারের কোন খরচ হলো না। আমার এই আবিষ্কার সারা পৃথিবী জুড়ে বিচার ব্যবস্থায় বিপ্লব নিয়ে আসবে।' উত্তেজনায় জ্বলছে নাসিমের চোখজোড়া, 'পৃথিবীর সব দেশ যদি এস.পি.আর সিস্টেম ব্যবহার শুরু করে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল বলে কিছু থাকবে না।'

কিছু একটা বলতে গেলেন মন্ত্রী সাহেব, হঠাৎ করে ঘড়ঘড়ে যান্ত্রিক শব্দ উঠতেই সবাই একযোগে ঘুরে তাকাল আমজাদ খাঁর দিকে। হেডসেটের বাতিগুলো নিভে গেছে, পিছনের প্যানেলে একটা লাল আলো জ্বলে উঠেছে।

'প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে!' দ্রুতপায়ে আমজাদ খাঁর দিকে এগিয়ে গেল সাবরিনা। প্যানেলের সুইচগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আসামীর কাছে আসবেন না কিন্তু!' নিরাপদ দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী সাহেব এবং ডা. জিনাত হুড়মুড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। নাসিম নড়ল না, কিন্তু ওর প্রখর ব্যক্তিত্ব ছাপিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে অস্থিরতা, চোখে অস্বস্তি মেশানো উৎকণ্ঠা।

আমজাদ খাঁর বিহ্বল ভাব কেটে গেছে; অবাক হয়ে চারদিকে দেখছে। সাবরিনা ওর মাথা থেকে হেডসেটটা খুলতে ব্যস্ত।

'বাস্তবে পুরোপুরি ফিরে আসতে প্রায় এক মিনিট সময় নেবে,' কাঁপা কাঁপা হাতে একটা ফাইল তুলে নিল নাসিম। বহুবছর ধরে এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। আমজাদ খাঁর প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করছে ওর আবিষ্কারের সাফল্য। মন্ত্রী নাজমুল হুদা আর ডা. জিনাত অনুমোদন করলেই সরকারীভাবে এস.পি.আর-এর ব্যবহার শুরু হবে। তারপর বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়বে সে! চোখ বুজলেই নাসিম ওর চেহারা দেখতে পায় টাইম ম্যাগাজিনের কভার আর বিদেশী টিভি স্ক্রীনে।

হাঁ করে সাবরিনার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমজাদ খাঁ।

হাসির চেষ্টা করতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, চোখের কোল বেয়ে নেমে এল দুফোঁটা অশ্রু। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু আবেগে গলা বুজে এল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল দুর্ধর্ষ খুনী আমজাদ খাঁ।

হেডসেটটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে সাবরিনা ম্লান হাসল, 'এটা কেমন প্রতিক্রিয়া। প্রায় সব আসামীই খুশিতে কেঁদে ফেলে। দ্বিতীয়বার জীবন ফিরে পাবার সুযোগ পেলে কেইবা খুশি হবে না?'

একটা বেল চাপ দিতেই দু'জন কর্মচারী এসে আমজাদ খাঁকে চেয়ার থেকে নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ল্যাব থেকে।

অবাক চোখে এতক্ষণ দেখছিলেন মন্ত্রী সাহেব, আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কিন্তু এখন ব্যাটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

'মাসখানেক ও থাকবে একটা ক্যাম্পে। চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ প্রহরাধীনে। তারপর সে মুক্তপুরুষ। একেবারে অন্য এক পরিবর্তিত আইনমান্যকারী নাগরিক। যে একমাস অন্তরীণ অবস্থায় থাকবে, সে সময় প্রায় সর্বক্ষণ ওর ওপর নজর রাখা হবে। উপযুক্ত কাউন্সিলিঙের ব্যবস্থাও হবে। আমার হিসেব যদি নির্ভুল হয়, তাহলে আমজাদ খাঁ আজ থেকে একজন নতুন মানুষ।' গর্বিত ভঙ্গিতে একে একে সবার দিকে তাকাল নাসিম।

ঠিক দু'ঘণ্টা পর নাসিম আর সাবরিনা ল্যাবের সামনে করিডরে পায়চারি করছে, দু'জনের হাতেই চায়ের কাপ। আবার কাজ শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

'তারপর, তোমার কি মনে হয়, সাবরিনা? আমরা সফল হব?' গভীর চোখে সহকারীর দিকে চেয়ে আছে নাসিম। এখনও বলার সময় পায়নি, তবে এই মেয়েটিকে ভালবাসে সে। যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে, তবে সাবরিনাও পছন্দই করে ওকে। কাজের সময় হঠাৎ করে হাতে হাত ঠেকে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে যায়, এমনকি চোখে চোখে চাইতেও মেয়ের রাজ্যের লজ্জা। নাহ্, আর দেরি করা ঠিক হবে না, প্রোজেক্টটা পাস হয়ে গেলেই এর একটা কিনারা করতে হবে।

'ওরা যখন আলোচনা করছিল, তখন দু'একটা কথা আমার কানে এসেছে। যা বুঝলাম তাতে মনে হলো বছর খানেকের মধ্যেই আমাদের প্রোজেক্ট সরকারী ভাবে চালু হয়ে যাবে,' ছোট্ট করে চায়ের কাপে চুমুক দিল সাবরিনা।

'তার মানে আমি সফল! উঃ!' প্রায় লাফিয়ে উঠল নাসিম।

'কংগ্রাচুলেশন্‌স্!' সাবরিনার চোখের কোলে কি ওটা বিষাদের চিহ্ন?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল নাসিম, সস্নেহে বলল, 'আমরা দু'জনেই একসঙ্গে এই প্রোগ্রামটা আবিষ্কার করেছি। কৃতিত্বও আমরা ভাগাভাগি করে নেব; কি বলো?'

মন্ত্রী নাজমুল হুদা কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাকলেন ওদেরকে, 'এই যে বিজ্ঞানীদ্বয়, তাড়াতাড়ি আসুন। দ্বিতীয় আসামীকে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

'তাহলে, স্যার, মনে হয় আমরা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি,' বলল নাসিম।

'তা আর বলতে,' বলতে বলতে সাবরিনার দিকে এগিয়ে গেলেন মন্ত্রী। আলগোছে হাত রাখলেন সাবরিনার পিঠে। 'আপনিও তো এ প্রোজেক্টে কাজ করছেন প্রায় প্রথম থেকে। এবার আপনার কাছ থেকে কিছু শুনব আমরা।' ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল নাসিম, ওই ঘিনঘিনে লোকটা সাবরিনাকে ছুঁয়ে আছে! কে না জানে নারীঘটিত ব্যাপারে এই মন্ত্রীর প্রচুর বদনাম আছে।

'ড. নাসিমই ভাল বলতে পারবেন, আমি ওঁর সহকারী মাত্র,' লাজুক হাসল সাবরিনা।

'না, আমরা আপনার কথাই শুনতে চাই,' ধীরে ধীরে হাতটা সাবরিনার কাঁধে তুলে দিলেন মন্ত্রী। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল নাসিম। এখন মুখ বন্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আবার সবাই জড়ো হয়েছে ল্যাবে। অ্যাটেনডেন্ট দু'জন ধরে ধরে নিয়ে আসছে আসামীকে। কিন্তু এবারের দৃশ্যটা আগের চেয়ে একটু অন্যরকম। কাঁদছে আসামী, কিছুতেই উঁচু

চেয়ারটার দিকে যেতে চাইছে না। ভীত চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, চোখে জল। বয়স খুব বেশি হলে বছর ত্রিশেক। চার্টে লেখা নামটা পড়ল নাসিম—আবদুস সোবাহান। এই যুবকও খুনের আসামী।

জোর করে চেপে ধরে রাখা হয়েছে তাকে উঁচু চেয়ারে, ছটফট করছে সে ছাড়া পাবার জন্যে। হেডসেট নিয়ে সাবরিনা এগিয়ে আসতেই আর্তনাদ করে উঠল সে, 'আমি নির্দোষ···আপা···ওদেরকে বলেন আমি নির্দোষ···'

দ্রুতহাতে কাজ সারল সাবরিনা, তারপর পিছিয়ে এসে দাঁড়াল নাসিমের পাশে। ফিসফিস করে বলল, 'মনে হয় একটু দেরি করা ভাল, আসামীর মানসিক অবস্থা এ মুহূর্তে ভাল নয়! একটু সুস্থির হয়ে নিক বরং।'

পাত্তা দিল না নাসিম, বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চালু করে দাও প্রোগ্রাম।'

চেয়ারে স্ট্র্যাপ বাঁধা অবস্থায় বাঁশপাতার মত কাঁপছে আবদুস সোবাহান, প্রলাপ বকার মত বারবার শুধু বলছে, 'ছেড়ে দেন আমারে···আমি নির্দোষ···বিশ্বাস করেন আপনারা···আমি কিচ্ছু করি নাই···'

জোর করে চোখ সরিয়ে নিল সাবরিনা, ব্যস্ত হয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে।

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মন্ত্রীর দিকে তাকাল নাসিম। 'আগে আরও দু'বার ডাকাতীর জন্য জেল খেটেছে লোকটা। এবার খুনের আসামী।'

'আমজাদ খাঁ যে কারাগারে ছিল, এও কি সেই একই কারাগারে থাকবে?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া শক্ত,' ঠোঁট টিপে হাসল নাসিম। 'প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রেখে কাজ করে প্রোগ্রামটা। জেল সম্বন্ধে এর যে অভিজ্ঞতা আছে, সে রকম জেলই সে পাবে। এই লোক আগে যে জেলে থেকে এসেছে, সম্ভবত সেখানেই ফিরে যাবে।'

মন্ত্রী নাজমুল হুদাকে একটু চিন্তিত দেখাল। 'কিন্তু যদি জেল খাটার কোন অভিজ্ঞতা না থাকে?'

'কুছ পরোয়া নেই। তখন প্রোগ্রামে যে কারাগার বানানো হয়েছে.

সেখানেই পাঠিয়ে দেয়া হবে আসামীকে।'

হঠাৎ করেই স্থির হয়ে গেল আসামী, চোখ বন্ধ করে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। চলতে শুরু করেছে প্রোগ্রাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সাবরিনা মনিটরে চোখ রেখে, 'স্যার, তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন! কোড ব্লু!'

মনিটরে চোখ বুলিয়ে কী-বোর্ডের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল নাসিম। আসামীর হার্টবিট বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছে, ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ডা. জিনাত প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'ব্যাপার কি? কি হচ্ছে?'

প্রায় ধমকে উঠল নাসিম, 'দাঁড়ান, এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে!' ঝড়ের বেগে ওর আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কী-বোর্ডে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কেটে যাচ্ছে মহামূল্যবান সময়, আসামীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। মৃগী রোগীর মত খিঁচুনী উঠছে থেকে থেকে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মন্ত্রী নাজমুল হুদা, 'দয়া করে কিছু একটা করুন! মারা যাচ্ছে আসামী!'

'আমার কিছু করার নেই,' হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল নাসিম, 'চালু হয়ে গেছে প্রোগ্রাম।'

'বলেন কি! পাওয়ার অফ করে দিন! বন্ধ করে দিন সব যন্ত্রপাতি!'

'কোন লাভ নেই। প্রোগ্রাম চলতেই থাকবে!'

'আশ্চর্য! ইমার্জেন্সির জন্যে কোনরকম ব্যবস্থা নেই?'

'এ ধরনের ইমার্জেন্সি আগে কখনও ঘটেনি! এরকম হবার কোন কারণই নেই! যদি না...' একটু ইতস্তত করল নাসিম, নার্ভাস ভঙ্গিতে চুলে হাত বুলাচ্ছে।

'যদি না...কি?' উত্তেজনায় প্রায় ধমকে উঠলেন মন্ত্রী নাজমুল হুদা।

'মনে হয় এই আসামী নির্দোষ!'

'নির্দোষ হয়ে থাকলে এখন কি হবে?' নাসিমের কাঁধ খামচে ধরলেন মন্ত্রী, কপালে ঘাম জমছে।

'জানি না! আমি জানি না!' বিড়বিড় করে বলল নাসিম। 'এই প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে শুধু অপরাধীদের জন্যে।'

'স্যার, লোকটা মারা যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল সাবরিনা।

'এই লোকের মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী থাকবেন, ড. নাসিম!' হিসিয়ে উঠলেন মন্ত্রী।

'কখনোই না! ওকে আমি মরতে দেব না!' সাবরিনাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থেকে সরিয়ে দিল নাসিম, ঝাঁপিয়ে পড়ল কী-বোর্ডের উপর।

'কি করছেন, স্যার?' অবাক হলো সাবরিনা।

'আমি ভিতরে যাচ্ছি, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব,' সাবরিনার চোখে চোখ রেখে বলল নাসিম।

'না!' ভয় পেল সাবরিনা। 'আপনার বিপদ হতে পারে, স্যার!'

'যেভাবেই হোক, ওকে বাঁচাতে হবে আমাদের, সাবরিনা!' দৃঢ়পায়ে খালি চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল নাসিম। 'আমি ওর জগতে গিয়ে হাজির হব, দেখি বুঝিয়ে শুনিয়ে বের করে নিয়ে আসতে পারি কিনা। এছাড়া ওকে বাঁচাবার কোন পথ খোলা নেই।'

হেডসেট পরাতে গিয়ে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল সাবরিনা, 'আপনার কোন বিপদ হবে না তো!'

পরম যত্নে ওর হাত ধরল নাসিম, 'চিন্তার কিছু নেই, কন্ট্রোলে তুমি তো আছই।'

দৌড়ে প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাবরিনা, প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চেপে রাখার চেষ্টা করছে। পাশের চেয়ারে বসা আবদুস সোবাহানের দিকে তাকাল নাসিম, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। তারপর সাবরিনার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি তৈরি। প্রোগ্রামটা চালু করে দাও।'

ডা. জিনাত বলে উঠলেন, 'গুড লাক, ডক্টর!'

দুই

অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতস্যাঁতে করিডর, দু'ধারে লোহার শিক ঘেরা ছোট

ছোট খোপ। দরজা খোলা। কয়েদীরা করিডরে হল্লা করছে। চারদিকে খিস্তী-খেউড় আর গগনবিদারী চ্যাঁচামেচি। নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে লোকগুলো। এদের মধ্যে বহুকষ্টে পথ বের করে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে নাসিম, উৎসুক চোখে খুঁজছে আবদুস সোবাহানকে। এখানেই কোথাও আছে সে। আঁশটে দুর্গন্ধ উঠছে চারদিক থেকে, নাকে হাত চাপা দিল নাসিম। আশেপাশের লোকগুলো যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, এই ছোট্ট জায়গাতেই ছুটোছুটি হুটোপুটি করছে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, রায়ট হচ্ছে কারাগারের মধ্যে। তবে রক্ষা, সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, নাসিমের দিকে কারও নজর নেই।

একটা বাঁক ঘুরতেই আবদুস সোবাহানকে দেখতে পেল নাসিম। কাৎ হয়ে শুয়ে আছে নোংরা মেঝেতে, ছুটতে থাকা কয়েদীরা পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে নিথর দেহটা। তাড়াতাড়ি ওকে টেনে একপাশে নিয়ে এল নাসিম। লক্ষ্য করল ওর পেটে বিশাল একটা ক্ষত, প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এজন্যেই মারা যাচ্ছে লোকটা! হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল নাসিম, ডাকল, 'এই যে, সোবাহান, শুনতে পাচ্ছ?'

অনেক কষ্টে চোখ খুলল সোবাহান, চোখের কোল বেয়ে নেমে এল দুফোঁটা অশ্রু।

ওর কাঁধে হাত রাখল নাসিম, 'শোনো, সোবাহান, চারদিকে যা দেখতে পাচ্ছ তার কিছুই সত্যি নয়। সবটাই একটা মায়া। তুমি এ মুহূর্তে কারাগারে নেই, আসলে বসে আছ আমার ল্যাবের চেয়ারে। বুঝতে পারছ?'

কোন কথা না বলে চোখ বুজল সোবাহান।

ওর কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল নাসিম। 'কি হলো? চোখ খোলো, সোবাহান! তাকাও আমার দিকে। এই কারাগার, এই কয়েদীরা—এসব কোনকিছুই আসলে সত্যিকারের নয়। মনে আছে, তোমাকে আমার ল্যাবে নিয়ে আসা হয়েছিল? সেনসরি বাইপাস প্রোগ্রাম চালানো হয়েছে তোমার ওপর, মনে নেই? তুমি বলছিলে তুমি নির্দোষ, মনে নেই?'

হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পেল লোকটা, আর্তস্বরে বলে উঠল, স্যার,

সত্যিই আমি নির্দোষ! বিশ্বাস করেন, আমি খুন করি নাই...'

আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ওর হাত ধরল নাসিম, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি, সোবাহান। আমি জানি তুমি নিরপরাধ। এখন মন দিয়ে শোনো, এখান থেকে তোমাকে বের হতে হবে। এই কারাগার সত্যিকারের কারাগার নয়। তোমার পেটের এই ক্ষতটাও সত্যিকারের নয়। এখন শুধু মনে করার চেষ্টা করো যে তুমি আসলে বসে আছ আমার ল্যাবের চেয়ারে। ঘটনাটা মনে পড়ে গেলেই চারদিকের এসব দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। তুমি ফিরে যাবে বাস্তবে।'

কোত্থেকে যেন ষণ্ডামার্কা এক কয়েদী এসে দাঁড়াল নাসিমের পেছনে, হাতে ভয়ঙ্করদর্শন একটা ছোরা। চেঁচিয়ে বলল, 'এই সুট পরা সাহেব আবার কোনহান থেইক্কা আইল? সইরা যান বলতাছি...'

ওদিকে নজর দিল না নাসিম, সোবাহানকে শক্ত করে ধরল, 'এসব বিশ্বাস কোরো না, সোবাহান! কিছুই সত্যি নয়!'

ওদিকে গুণ্ডা কয়েদী চীৎকার করতে করতে নাসিমের পিঠে ছোরা চালিয়েছে। বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ছোরা শরীর ভেদ করে, নাসিমের কিছুই হলো না। হাসল নাসিম, 'দেখলে? এ সবকিছুই মিথ্যা। আমি জানি বলে আমার কিচ্ছু হলো না। এখন তোমাকেও তা বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস না করলে এখান থেকে বের হতে পারবে না।'

'মিথ্যা!' ঘোলা চোখে চেয়ে রইল সোবাহান, পেটের ক্ষতে হাত রাখল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। অনেক কষ্টে কি যেন বলার চেষ্টা করল, 'কিন্তু...'

'তোমাকে কেউ ছুরি মারেনি, সোবাহান! তোমার পেটে কোন ক্ষত নেই। মনে করার চেষ্টা করো, তুমি আমার ল্যাবরেটরিতে আছ। মনে পড়ে? এই যে, আমার হাত ধরো!' নাসিমের হাতে হাত রাখল সোবাহান, চোখভরা নিদারুণ যন্ত্রণা।

পরমুহূর্তেই বাস্তবে ফিরে এল নাসিম। ল্যাবের চেয়ারে বসে আছে, মাথায় হেডসেট। ঝট করে পাশের চেয়ারের দিকে তাকাল। চেয়ার খালি। সোবাহান নেই। অবাক ব্যাপার, ল্যাবে কেউই নেই! এরা সব গেল কোথায়? কব্জির ঘড়ি দেখল নাসিম। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড কেটেছে

ওর চেয়ারে। হেডসেটটা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে এল নাসিম, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল ল্যাবের বাইরে।

সোবাহানের নিথর দেহটা শুইয়ে রাখা হয়েছে করিডরের শীতল মেঝেতে, সাবরিনা বসে আছে ওর মাথাটা কোলে নিয়ে। কাঁদছে। ডা. জিনাত দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মত। নাজমুল হুদা তাঁর মোবাইল ফোনে কথা বলছেন, কাকে যেন নির্দেশ দিচ্ছেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্যে।

হাঁটু গেড়ে সোবাহানের পাশে বসে পড়ল নাসিম। পাল্‌স্ দেখার চেষ্টা করল। কঠিন কণ্ঠে ডা. জিনাত বলে উঠলেন, 'কোন লাভ নেই! মরে গেছে লোকটা।'

'সব ঠিকই ছিল, স্যার!' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল সাবরিনা। 'হেডসেটটা খুলে নেবার পর নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। দু'পা এগুতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।'

নাসিমের পায়ের নিচে পৃথিবীটা দুলতে শুরু করেছে। অসুস্থ বোধ করল। বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'কিন্তু আমি তো ওকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম!'

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে রাগত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন মন্ত্রী নাজমুল হুদা, রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে বললেন, 'এই লোকের মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী, ড. নাসিম!'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু নাসিম আর সাবরিনা এখনও ল্যাবেই আছে, পাথরের মূর্তির মত বসে আছে যে যার ডেস্কে। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে নাসিম বলে উঠল, 'আমার সাধ্যমত সবকিছুই আমি করেছি।'

'জানি,' মাথা নাড়ল সাবরিনা। 'আমি শুধু ভাবছি, আজ সকালেই না আমরা সাফল্যের গর্বে ফেটে পড়ছিলাম! অথচ দিন শেষ না হতেই...' কথাটা শেষ করল না ও।

'আমাদের কোন দোষ নেই, রিনা। আগে থেকে অনুমান করার কোন উপায় ছিল না। পুরোপুরি গবেষণা করতে আরও বহুদিন লেগে যেত। শুধু শুধু পয়সা আর সময়ের অপচয় হত।'

'স্যার!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সাবরিনা। 'একজন লোক অকারণেই মরে গেল, আর আপনার কাছে পয়সা আর সময়টাই বেশি বড় হয়ে গেল? এ ব্যাপারে আপনার কি কোন দায়িত্বই নেই?'

'রিনা, এস.পি.আর প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে অপরাধীদের জন্যে। কে দোষী, কে নির্দোষ সেটা দেখা আমার কাজ নয়। আমার কাজ অপরাধীদের শাস্তি দেয়া।'

'আদালত যে সবসময়ই ন্যায়বিচার করবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভুল তো সবারই হয়!'

'সেটা আদালতের ব্যাপার। ওরাই বিচার করবে, তারপর শাস্তি নির্ধারণ করবে। ওরা যদি ভুল করে, তাহলে সে দায়িত্ব ওদের। আমার কি দোষ?'

'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'কি, বলো,' একটু অবাক হলো নাসিম।

'আমি নিশ্চিত যে নির্দোষ লোকের শাস্তি পাবার সম্ভাবনাটা একবারও আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, আপনিও কি এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তা করেননি?'

'তুমি কি আমার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছ? তোমার কি ধারণা আমি ইচ্ছে করেই লোকটাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি?'

'যদি আপনার ভুলে ঘটনাটা ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি জেনেশুনে আপনি এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি ক্ষমার অযোগ্য।'

'আশ্চর্য!' রাগে ডেস্কে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল নাসিম। 'তুমি প্রথমদিন থেকেই আমার সঙ্গে আছ, আমরা দু'জনে একসঙ্গে অসংখ্য দাগী আসামীকে পথ দেখিয়েছি, তারা এখন সমাজের আর দশজনের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। সমাজের জন্য এটা আমাদের কতবড় দান! আর তুমি কিনা আমার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছ?'

কোন কথা না বলে সাবরিনা পরনের ল্যাবকোটটা খুলতে লাগল, বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে একগাদা প্রিন্টআউট সাবরিনার ডেস্কে আছড়ে ফেলল নাসিম। 'একদিন এই এস.পি.আর প্রোগ্রাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ

আবিষ্কার হিসেবে সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি পাবে! ওরা ডেকে নিয়ে আমাকে নোবেল পুরস্কার দেবে! দেখে নিয়ো…'

কথা শেষ করার আগেই দরজায় খাকী ইউনিফর্মধারী দু'জন পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়াল। ডানদিকের জন এগিয়ে এল হাতে হাতকড়া নিয়ে, 'আপনিই ডক্টর নাসিম হারুন?'

'জ্বী…কিন্তু…'

'আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আবদুস সোবাহানকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

যমদূতের মত এগিয়ে আসছে লোকটা, চমকে উঠল নাসিম, 'কি বলছেন এসব? রিনা…ওদেরকে বলো আমার কোন দোষ নেই! ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট! রিনা…' পুলিশ দু'জন জোর করে নাসিমকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাবরিনা হঠাৎ করে যেন প্রাণ ফিরে পেল, এক ঝটকায় টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। কাঁপা হাতে কোনমতে ডায়াল ঘুরাতে ঘুরাতে নাসিমের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আপনার ল-ইয়ারকে ফোন করছি, স্যার! চিন্তা করবেন না…'

ঠিক দু'মাস পরে শুনানি শুরু হলো। আদালতে লোক ভেঙে পড়েছে। পাটভাঙা ঝকঝকে সাদা শার্ট আর দামী কালো সুটে নাসিমকে ভীষণ স্মার্ট দেখাচ্ছে, কে বলবে সে খুনের আসামী? ঠিক পিছনেই দর্শকের সারিতে বসে আছে সাবরিনা। লম্বা খোলা চুল, মেকাপবিহীন মুখ আর হালকা রঙের শাড়িতে বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি।

কাঠগড়ায় সাক্ষীর আসনে বসে আছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আমজাদ খাঁ। সরকারীপক্ষের সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছে তাকে। সে মুখ খুলতেই নাসিমের আত্মবিশ্বাসী হাবভাব চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছে আমজাদ খাঁ, 'ওরা বলছে মাত্র একঘণ্টা ওই মেশিনে ছিলাম আমি। কিন্তু ওই একটা ঘণ্টা আমার জীবন শেষ করে দিল…' হু হু করে কেঁদে উঠল সে।

'একটু বুঝিয়ে বলো, আমজাদ খাঁ। ওই মেশিনটা তোমার কি

ক্ষতি করেছে?' জানতে চাইল উকিল।

'এরপর থেকে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখি···রাতে ঘুমাতে পারি না···কোন কাজকর্মও করতে পারি না। দিনরাত শুধু মনে পড়ে সেইসব ভয়ঙ্কর স্মৃতি! এভাবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?' বাঁ হাতের পিঠে চোখ মুছল সে।

'কিন্তু ওই মেশিনে না গেলে তোমাকে তো পঁচিশ বছরের জন্যে জেল খাটতে হত। এখন তুমি জেলে থাকতে। সেটাই কি ভাল হত?'

'আমাকে আপনারা পঁচিশ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দেন, স্যার! শুধু ওই একঘণ্টার দুঃস্বপ্ন ফিরিয়ে নেন! আমার জীবনটা ফিরিয়ে দেন! এরচেয়ে মরণও ভাল ছিল!'

'কি বললে? আর একটু জোরে বলো!'

'স্যার, এরচেয়ে মরণও ভাল ছিল,' বলতে বলতে সরাসরি নাসিমের চোখে চোখ রাখল আমজাদ খাঁ।

সহ্য করতে পারল না নাসিম, চোখ সরিয়ে নিল।

পরদিন সাবরিনার ডাক পড়ল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আজ ওর লম্বা চুলগুলো হাতখোঁপায় বাঁধা, পরনে সাদা ফুলতোলা হালকা নীল সিল্ক শাড়ি। সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ধীর-স্থিরভাবে, চিন্তাভাবনা করে।

'ডক্টর নাসিমের মত কর্মনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কাজ ছাড়া আর কিছু তিনি বোঝেন না। এই প্রোজেক্টের সাফল্যই তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।'

'প্রোজেক্টের সাফল্য বলতে কি বোঝাচ্ছেন?' তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করল সরকারী উকিল।

'ডক্টর নাসিমের সারাজীবনের স্বপ্ন তিনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।'

'আমাদের জানামতে আপনি ডক্টর নাসিমকে অনুরোধ করেছিলেন আবদুস সোবাহানের উপর যাতে প্রক্রিয়াটা না চালানো হয়, তা কি সত্যি?'

'জ্বী,' চোখ নামিয়ে নিল সাবরিনা, একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আসামী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সেজন্যেই আমি অনুরোধ

করেছিলাম যাতে ওই অবস্থায় প্রোগ্রামটা চালু না করা হয়।'

'ডক্টর নাসিম কি আপনার কথা শুনেছিলেন?'

'না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাবরিনা।

'উনি কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলেন যে ভাবনার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ঠিক হয়নি, তাই না? ডক্টর নাসিম ভুল করেছিলেন।'

কোন উত্তর দিল না সাবরিনা, শুধু চোখভরা ব্যথা নিয়ে চেয়ে রইল অদূরে বসা নাসিমের দিকে।

যেদিন নাসিমের সাক্ষ্য নেওয়া হলো, সেদিন আদালতে তিল ধারণের জায়গা নেই। কয়েকজন হোমরাচোমরা সরকারী আমলাও এসেছেন দর্শক হিসেবে। তার মধ্যে মন্ত্রী নাজমুল হুদাকেও দেখা যাচ্ছে। সাবরিনার ঠিক পাশেই বসেছেন তিনি। আমলাদের উপস্থিতির কারণে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা চারদিকে। ওয়াকি-টকি হাতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ছুটাছুটি করছে এদিক ওদিক।

'ডক্টর নাসিম, আপনি কি জানতেন, একজন নিরপরাধ লোককে ওই চেয়ারে বসালে কি বিপদ হতে পারে?'

'কে দোষী, কে নির্দোষী, সে বিচার করবে আদালত। আমার কাজ শুধু শাস্তি দেয়া।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় মাথা উঁচু করে অহঙ্কারী ভঙ্গিতে বসে আছে নাসিম।

'প্রশ্নের উত্তর দিন, ডক্টর নাসিম।'

'হ্যাঁ, আমি জানতাম!' প্রায় চীৎকার করে উঠল নাসিম। 'কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সূচনা হতে পারে, তা আমি আঁচ করেছিলাম। কিন্তু ঠিক কি ধরনের বিপদ হতে পারে, তা আঁচ করার উপায় ছিল না। লোকটা মারা যাবে তা আমি চিন্তাও করিনি।'

'তারপরেও আপনি সোবাহানকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলেন!' উকিলের কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা।

'দেখুন, এটা আদালতের ভুল। আমার ভুল নয়!' উত্তেজনায় দু'হাতে কাঠগড়ার রেলিঙ চেপে ধরল নাসিম। 'আপনারা বুঝতে পারছেন না, এস.পি.আর সিস্টেম সারা পৃথিবীর বিচার ব্যবস্থায় বিপ্লব

নিয়ে আসবে! যে কোন বিপ্লবেই শত শত লোক প্রাণ হারায়! এক্ষেত্রে দু'চারটা প্রাণহানী তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। খবর নিয়ে দেখুন প্রতিটা কারাগারে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে প্রতিদিন কত কয়েদী মারা যাচ্ছে!' আদালতে পিনপতন নিরবতা। অসহায়ের মত একবার চারদিকে তাকাল নাসিম, তারপর প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল, 'এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র! আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না, আদালতের ভুলে লোকটা প্রাণ হারিয়েছে, আমার ভুলে নয়!'

দু'দিন পর রায় বের হলো। আবদুস সোবাহানকে হত্যার অপরাধে ডক্টর নাসিম হারুনকে পঁচিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। তার ঠিক তিনদিন পরে সরকারী উদ্যোগে নাসিমের ল্যাবরেটরির যাবতীয় যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে ফেলা হলো।

ঝনঝন শব্দ তুলে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল লোহার মজবুত গরাদ। ভীতচোখে চারদিকে তাকাল নাসিম। ধূসর রঙা স্টীলে মোড়া লম্বা করিডর। খালি পায়ের নিচে শীতল কংক্রিটের মেঝে। গোসল করানো হয়েছে নাসিমকে। পরানো হয়েছে ডোরাকাটা পায়জামা আর শার্ট। গার্ড বা অন্য কোন জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। করিডরের একপ্রান্তে একা দাঁড়িয়ে আছে নাসিম, একদম একা।

বাজেট ঘাটতির কারণে সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত কারাগারেও কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সে জায়গা পূরণ করেছে টেকনোলজি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এতবড় একটা কারাগার নিয়ন্ত্রণ করছে হাতে গোনা কয়েকজন লোক।

লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে আসছে যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'চার পা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়ান।' সাদা রঙ করা চৌকো একটা জায়গায় দাঁড়াল নাসিম, সঙ্গে সঙ্গে সিলিঙে ফিট করা স্ক্যানার জ্যান্ত হয়ে উঠল। একঝলক উজ্জ্বল আলো খেলে গেল শরীরের আনাচে কানাচে। নাসিম বুঝল, শরীরের কোথাও লুকানো অস্ত্র বা কোন নিষিদ্ধ বস্তু আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হলো। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার, 'এবার এগিয়ে যান মাটিতে আঁকা সাদা দাগ ধরে। মনে

রাখবেন, দু'পাশের নীল দাগের বাইরে পা ফেলবেন না। নীল দাগ স্পর্শ করলেই শরীরে বৈদ্যুতিক শক খাবেন।' নাসিম লক্ষ্য করল, মেঝের দু'ধারে দেয়াল ঘেঁসে গাঢ় নীলরঙা দুটো দাগ চলে গেছে করিডরের শেষ প্রান্তে, সাদা দাগটা ঠিক মাঝখানে। সাবধানে সাদা দাগ ধরে সামনে এগুলো নাসিম। নির্দেশ অনুযায়ী পৌঁছল সেল্ ব্লক পাঁচে। এতক্ষণে একজন গার্ডের দেখা পাওয়া গেল। লোকটা নাসিমের দিকে তাকাল না, দরজা খুলে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিল দরজাটা।

সেল ব্লক পাঁচ। সরু একটা করিডর। দু'ধারে ছোট ছোট খুপরী। লোহার শিকের ওধারে দেখা যাচ্ছে কয়েদীদের। উৎসুক চোখে দেখছে নাসিমকে, ছুঁড়ে দিচ্ছে নানারকম মন্তব্য। নয় নম্বর খুপরীর সামনে এসে দাঁড়াল নাসিম। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে হুড়কো তুলে দিল গার্ড, ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল নাসিম, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল লোহার শিক। বিড়বিড় করে উঠল নিজের অজান্তেই, 'না···না···কিছুতেই না···।' পিছন থেকে কে যেন ওর ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ফেলল, আছড়ে ফেলল পিছনের দেয়ালে। ব্যথায় চীৎকার করে উঠল নাসিম, উস্কখুস্ক চুল আর দাড়িগোঁফে আবৃত ভয়ঙ্কর একটা মুখ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। হলুদ দাঁত দেখিয়ে হাসল লোকটা, 'শুনলাম আপনে নাকি কয়েদীগোর উপ্‌রে অত্যাচার করেন? কি হইল, কথা কন না ক্যা? মনে রাখবেন, এইহানে অনেক লোক আছে যারা আপনের উপর খুশি না,' বলতে বলতেই নাসিমের পাঁজরে লাথি চালাল লোকটা। মাটিতে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল নাসিম।

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। ঠিক দশটায় আলো নিভে যাবে। আর ঠিক দু'মিনিট পর আলো নিভে যাবে···' একদিকের দেয়ালে ট্রেনের ক্যুপের মত দুটো বাঙ্ক গাঁথা। এক লাফে উপরের বাঙ্কে উঠে পড়ল লোকটা। পা ঝুলিয়ে বসে গা জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

নড়ল না নাসিম। পেটে হাত চেপে ধরে একইভাবে শুয়ে রইল মেঝেতে, ব্যথায় কোকাচ্ছে। ঠিক দু'মিনিট পর ঘোষণা অনুযায়ী নিভে

গেল সব আলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো কারাগার। পরমুহূর্তেই জোরাল ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মৃগী রোগীর মত কাঁপতে থাকল নাসিম। সর্বনাশ! আলো নিভে যাবার পরই মেঝেটা ইলেকট্রিফায়েড হয়ে গেছে, যাতে কেউ বিছানা ছেড়ে নড়তে না পারে। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। অনেক কষ্টে হাঁচড়েপাঁচড়ে নিচের বাঙ্কে উঠে পড়ল নাসিম। শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল। অজানা কারও উপর রাগে আর অভিমানে ফেটে পড়তে চাইছে ভেতরটা। দু'চোখের কোল বেয়ে নেমে এল দুফোঁটা অশ্রু। আধো ঘুম আধো জাগরণে কেটে যেতে লাগল অদ্ভুত রাতটা।

ঠিক কতক্ষণ পর কে জানে, তন্দ্রা কেটে গিয়ে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল নাসিম। নিচু ফিসফিসে ভৌতিক স্বরে কে যেন বলে যাচ্ছে, 'শুয়োরের বাচ্চা! এইবার বাগে পেয়েছি তোকে! এখান থেকে পালাবি কোথায়?' চমকে উঠে বসল নাসিম। উপরের বাঙ্কে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে ওর রুমমেট, নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাহলে কথা বলছে কে? কেন যেন মনে হচ্ছে ওকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। ভীত কণ্ঠে নাসিম বলে উঠল, 'কে আপনি? কি বলছেন এসব?'

'আমি সোবাহানের ভাই। তুই খুন করেছিস আমার ভাইটাকে! তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছিস তাকে!'

'না!' মরিয়া হয়ে বলে উঠল নাসিম, 'আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। ওর কোন ক্ষতি করতে চাইনি!'

'হারামজাদা!' তীব্র ঘৃণা মেশানো অশরীরী কণ্ঠস্বরটা একটু যেন জোরদার হলো, 'প্রতিশোধ নেব এবার! প্রতিশোধ!'

কোত্থেকে কণ্ঠস্বরটা ভেসে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। ভয়ে দেয়াল ঘেঁসে গুটিসুটি মেরে বসে রইল নাসিম। সেই অবস্থাতেই কেটে গেল বাকি রাতটুকু।

ভোর ঠিক পাঁচটায় তারস্বরে ঘুম-ভাঙানী সাইরেন বেজে উঠল। অন্যান্য কয়েদীদের দেখাদেখি ঘরের কোণে ফিট করা ছোট্ট বেসিনে হাতমুখ ধুয়ে নিল নাসিম। পাঁচটা বেজে দশ মিনিটে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে খুলে গেল সবগুলো দরজা। যার যার খুপরী থেকে বেরিয়ে এল সবাই।

চট্ করে পাশের খুপরীটা দেখে নিল নাসিম। অবাক হলো। কেউ নেই! নিপাট নিভাঁজ বিছানা, দেখে মনে হচ্ছে না কেউ থাকে এখানে। তাহলে রাতে কে কথা বলছিল?

পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে পাশের ব্লক থেকে নাশতার ট্রে নিয়ে আসতে হলো। আলু ভাজা আর দুটো আটার রুটি। কিন্তু সেটুকুও খাওয়া গেল না। ওর রুমমেট না দেখার ভান করে ধাক্কা দিয়ে ট্রে-টা ফেলে দিল মাটিতে। কোন প্রতিবাদ করল না নাসিম। সুবোধ বালকের মত পরিষ্কার করে ফেলল মেঝেটা।

নাশতা-পর্বের পরে ঘণ্টাখানেক একটা বিশাল হলঘরে ছেড়ে দেয়া হলো সব কয়েদীদের। খেলাধুলা, শরীর চর্চা আর আড্ডায় মেতে উঠল সবাই। শুধু নাসিমই বসে রইল এক কোণে। ঠিক সাতটায় কাজের ঘণ্টা বেজে উঠল। অস্ত্রধারী গার্ডের তত্ত্বাবধানে সবাই কাজে লেগে গেল। বারান্দা আর বাথরুম ধোওয়ামোছার দলটায় ভিড়িয়ে দেয়া হলো নাসিমকে। দুপুরের খাদ্য বিরতির একঘণ্টা ছাড়া পুরো দিনটা প্রচণ্ড পরিশ্রম করল নাসিম।

রাতে বাঙ্কে পিঠ ঠেকাতেই ঘুমে এলিয়ে এল দু'চোখ। ঠিক কত রাতে কে জানে, চট্ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ওই তো! স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে গতরাতের সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর! 'খুন হয়ে যাবি, শুয়োরের বাচ্চা! মজা টের পাবি! হা হা হা...'

সকালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কারাগারের কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করল নাসিম। মহিলা বেশ হাসিখুশি এবং সুশ্রী, অমায়িক ব্যবহার। নাসিম অফিসে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আসুন, আসুন।'

'আপনিই ডক্টর লায়লা হামিদ?'

'জ্বী,' মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা। 'আর আপনি নাসিম হারুন।'

'ডক্টর নাসিম হারুন,' পাতলা গদি আঁটা একটা চেয়ারে বসতে বসতে একটু রূঢ় ভঙ্গিতে বলল নাসিম।

'বলুন, আপনার কি সমস্যা?' হাসিটা একটুও ম্লান হলো না।

'সমস্যা!' প্রায় ধমকে উঠল নাসিম। 'এখানে ঠিকভাবে চলছে কোন্ জিনিসটা? প্রয়োজনের সময় কোন গার্ডের পাত্তা পাওয়া যায় না!

খাবার নামে যে সব অখাদ্য গেলাচ্ছেন, তা পরিমাণে এতই অল্প যে একটা পাখীরও পেট ভরবে না!'

'হারুন সাহেব, জানেন তো, বাজেটের কারণে আমাদের ব্যয় সংক্ষেপ করতে হয়েছে। কি আর বলব আপনাকে, খুবই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের।'

'কিন্তু কার কাছে এসব ব্যাপারে অভিযোগ করব? গার্ডরা তো কয়েদীদের সঙ্গে কথাই বলে না। সত্যি বলতে কি, আপনিই প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলছেন।'

'যখন দরকার মনে করবেন, আমার কাছে চলে আসবেন। আপনাদের অভিযোগ শোনাই আমার কাজ।'

'ধন্যবাদ।' একটু ইতস্তত করে নাসিম বলেই ফেলল, 'আর একটা কথা। আমার পাশের সেলে একজন কয়েদী আছে, সে আবদুস সোবাহানের ভাই। রাতে সে আমাকে ভয় দেখায়। আমাকে নাকি খুন করবে!'

'আবদুস সোবাহান, মানে যাকে আপনি হত্যা করেছিলেন?'

'দেখুন, আমি কাউকে হত্যা করিনি। ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু সেই সোবাহানের ভাই এখন আমার পিছু নিয়েছে।'

'কিন্তু সোবাহানের কোন ভাই তো এ কারাগারে নেই!'

'হয়তো সে আদৌ সোবাহানের ভাই-ই না। আমি তা জানি না। কিন্তু প্রতিরাতেই তার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই...'

'তার মানে আপনি তাকে দেখেননি?'

'না, শুধু শুনতে পাই লোকটা আমাকে গালাগালি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। সারারাত আমি ঘুমাতে পারি না!'

'আমাদের রেকর্ডপত্র অনুযায়ী নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আপনার পাশের সেলটা খালি, সেখানে কেউ থাকে না। সোবাহানের ভাই তো নয়ই। যতদূর মনে হয় রাতের কণ্ঠস্বরটা আপনার কল্পনা মাত্র। গত কয়েক দিনে আপনার মনের ওপর প্রচুর চাপ পড়েছে...'

'কি বলছেন এসব? আমার মস্তিষ্কের দোষ দেখা দিয়েছে? আমি পাগল?'

'সোবাহানের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?'

'কেন? আপনাকে তো বললামই, ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'আচ্ছা, না হয় দুর্ঘটনাই হলো। কিন্তু লোকটা তো মারা গেছে। আপনার তাতে একটুও কষ্ট হয়নি?'

'আশ্চর্য! কষ্ট হবে না কেন? কিন্তু তাতে তো আর আমার কোন হাত নেই!'

'ও, আচ্ছা!'

'আচ্ছা মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন?' রাগে প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল নাসিম।

'আপনি কি শুনতে চান?' মহিলার মুখের হাসিটুকু এখন পর্যন্ত অম্লান!

'এসব কি বলছেন আবোল-তাবোল? আপনি কি মন দিয়ে আমার কথা শুনছেন না?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, তাই তো বুঝতে পারছি-না!'

'আমি বলতে চাইছি, আমার এ জায়গায় থাকার কথা নয়। আমি নির্দোষ!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নাসিম।

মিষ্টি হেসে লায়লা হামিদ বললেন, 'নিজের কর্মফলের দায়িত্ব যদি নিজে না নেন, তাহলে বিবেক আপনাকে তাড়া করে ফিরবে সর্বক্ষণ।'

'আশ্চর্য! কি বলছেন এসব?' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই পাথরের মত জমে গেল নাসিম। ওর ছায়া পড়েছে জানালার পাশে বসা লায়লা হামিদের শরীরে, শরীরের ছায়া ঢাকা অংশটুকু কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে! লায়লা হামিদের শরীর ভেদ করে পিছনের দেয়াল দেখতে পাচ্ছে নাসিম! এতক্ষণে ও লক্ষ্য করল, ছাদের চারকোনায় চারটা প্রজেক্টর ফিট করা আছে। লায়লা হামিদ রক্তমাংসের মানুষ নয়, হলোগ্রাম মাত্র! মরীচিকা!

ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল নাসিম। 'আপনি মানুষ না! হলোগ্রাম!'

'বাজেট কাট্!' ঠিক একইভাবে হাসছেন তিনি।

হতাশায় দু'হাতে মুখ ঢাকল নাসিম।

মাসখানেক পরের কথা। দুপুরে খাবার পরে সেলের এককোণে পা

গুটিয়ে বসে ছিল নাসিম। হাশেম, ওর রুমমেট, নিজের বাঙ্কে বসে মনোযোগ দিয়ে পেশেন্স খেলছে। গমগম করে উঠল স্পীকার, 'নাসিম হারুন! নাসিম হারুন! গার্ড-পোস্টে রিপোর্ট করুন!'

গার্ড-পোস্টে গিয়ে জানা গেল কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভিজিটার্স রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই মনটা ভাল হয়ে গেল। মোটা কাঁচের ওপাশে ছবির মত বসে আছে সাবরিনা। সাদা সুতোর কাজ করা কালো একটা শাড়ি পরনে, ছেড়ে দেয়া এলোচুল, চোখে জিজ্ঞাসা আর হালকা বিস্ময়। এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মত শরীরটা জুড়িয়ে দিল ওর উপস্থিতি।

'একি চেহারা হয়েছে আপনার?' প্রায় আঁৎকে উঠল সাবরিনা।

'আমি ভেবেছিলাম আমাকে ভুলেই গেছ!'

'আরও আগেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু ওদিকের ঝামেলায়...' কথাটা শেষ করল না সাবরিনা।

'তারপর, কেমন আছ, বলো। ল্যাবের কি অবস্থা?' বলতে বলতে একটু থমকে গেল নাসিম। 'ও, হ্যাঁ, ল্যাবের যন্ত্রপাতি তো সব নষ্ট করে ফেলেছে ওরা। কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, আমরা নতুন করে আবার সব গড়ে তুলব। আমি এখান থেকেই তোমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারব, তোমার...'

'স্যার, আমি ছুটি নিয়েছি। সম্ভবত চাকরিটা ছেড়ে দেব।' চোখ নামিয়ে নিল সাবরিনা।

দমে গেল নাসিম। 'ও। ছুটি নিয়েছ! কিন্তু চাকরি কেন ছাড়বে? আর দু'তিন মাসের মধ্যেই আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসব, তখন আবার নতুন করে...'

'স্যার, আপনি জানেন না, আপনার অ্যাপিল অগ্রাহ্য করা হয়েছে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেছি আমি। দু'একদিনের মধ্যেই আপনার কাছে লিখিত নোটিস আসবে।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না নাসিম, শূন্য চোখে চেয়ে রইল নতমুখী সাবরিনার দিকে। 'অথচ...কত কথা বলার ছিল তোমাকে! কতদিন ভেবেছি...নতুন একটা জীবন শুরু করব তোমার সঙ্গে...' বলতে বলতেই সাপ দেখার মত চমকে উঠল নাসিম।

টেবিলের উপর রাখা সাবরিনার বাঁ হাতের আঙুলে ঝকঝক করছে হীরের আঙটি! কষ্ট করে ঢোক গিলল নাসিম, কোনমতে বলল, 'ওই আংটিটা···কে?'

মুখ তুলল না সাবরিনা, অস্ফুটে বলল, 'নাজমুল হুদা।'

'মন্ত্রী নাজমুল হুদা?' মাথায় বাজ পড়লেও বুঝি এতটা অবাক হত না নাসিম।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সাবরিনা, রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত। পারলে ক্ষমা করে দেবেন, স্যার!' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

তীব্র আক্রোশে বদ্ধ কাঁচের উপর আছড়ে পড়ল নাসিম। চীৎকার করে উঠল পাগলের মত, 'যেয়ো না সাবরিনা! যেয়ো না! আমি বেরিয়ে আসব এই নরক থেকে! তুমি দেখে নিয়ো, কেউ আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারবে না!'

এর ঠিক দু'দিন পরে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল নাসিম। শাস্তিস্বরূপ মাটির নিচের অন্ধকার কুঠুরিতে আটকে রাখা হলো ওকে। চারফিট বাই চারফিট গর্তের মত গুমোট অন্ধকারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলল নাসিম। নিকষ কালো আঁধার ছাড়া আর কিছুই রইল না। দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল বিকারগ্রস্তের মত, 'কি করেছি আমি তোমাদের? কেন এমন কষ্ট দিচ্ছ? আমি তো জানোয়ার নই···মানুষ! শুনতে পাচ্ছ তোমরা? আমি মানুষ! আমি মানুষ!' মাটির তলার সেই গহ্বরে নাসিমের আহাজারি শোনার মত কেউ ছিল না। সাতদিন পর প্রায় উন্মাদ অবস্থায় সেখান থেকে বের করা হলো ওকে, পাঠিয়ে দেয়া হলো ওর সেলে। এরপর থেকে কারও সঙ্গে তেমন কথা বলত না সে। মুখ বুজে নিজের কর্তব্য করে যেত, না হলে নির্বাক হয়ে বসে থাকত নিরেট দেয়ালের দিকে চেয়ে। শুধু মাঝে মাঝে গভীর রাতে আশেপাশের কয়েদীরা শুনত বিড়বিড় করছে নাসিম ঘুমের ঘোরে, 'ভেবেছিলাম বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করব···দুনিয়া অবাক হয়ে যাবে আমার কৃতিত্বে···আমি তো ওদের উপকার করতে চেয়েছিলাম, ওরা কেন বুঝল না! একটা জীবন নষ্ট হয়েছে, তাতে কি?

আরও কতজন যে বেঁচে গিয়েছে...একটা জীবন...আহ্...একটা জীবন...'

বহু বছর পর আবার একদিন খড়মড় করে উঠল স্পীকার, 'নাসিম হারুন! নাসিম হারুন! গার্ড পোস্টে রিপোর্ট করুন।'

নাসিম আগে থেকেই জানে, আজ ওর ছাড়া পাবার দিন। কোনরকম উত্তেজনা বোধ করল না ও। আজকের দিনটা যেন অন্য সবদিনের মতই। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল সে সেলের বাইরে। নিষ্ঠুর সময় চিহ্ন ফেলে গেছে ওর সারা শরীরে। মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়েছে। পেছনদিকে যে কটা চুল আছে, তার সবই প্রায় সাদা। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। কুঞ্চিত ত্বকের কোথাও ভাবের কোন চিহ্ন নেই। এই বৃদ্ধের শরীরের কোথাও পঁচিশ বছর আগেকার যুবা নাসিম হারুনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্ড পোস্টের দিকে রওনা হলো নাসিম। এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ও? কেউ তো ওর জন্যে অপেক্ষা করে নেই!

কাগজের বাক্সে ছাই রঙা দামী একটা সুট রাখা আছে। চিনতে পারল নাসিম, এটা ওরই। প্রথমদিন এই সুটটা পরেই কারাগারে এসেছিল সে। শুধু সুট নয়, ওর অক্সফোর্ড শূ, চাবির রিঙ, ওয়ালেট, আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস দেখা যাচ্ছে বাক্সে। বিনাবাক্যব্যয়ে পোশাক পাল্টাতে শুরু করল নাসিম। মাথাটা যেন একটু ঘুরে উঠল।

তিন

'স্যার!' সাবরিনা ঝুঁকে আছে নাসিমের মুখের ওপর। লাবণ্যে ঢলঢল মুখের দু'ধারে ঝুলছে এক ঢাল কালো চুল, পরনে সাদা ল্যাবকোট। সাবরিনার মুখের দু'পাশে আরও দুটো পরিচিত মুখ। সাফারি সুট পরা মন্ত্রী নাজমুল হুদা আর ডা. জিনাত হায়দার। বিহ্বল চোখে একে একে

ওদের সবাইকে দেখল নাসিম। কি ব্যাপার? স্বপ্ন? না তো! স্বপ্ন হতেই পারে না! ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে গেল নাসিম। কি হচ্ছে এসব? এটা তো ওরই ল্যাব! বহু বছর আগেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে ল্যাবটা! কেমন করে এখানে এল সে?

'নড়বেন না, স্যার!' দু'হাতে ওর কাঁধ চেপে ধরল সাবরিনা। নাসিম টের পেল, চেয়ারে বসে আছে সে পিছনে হেলান দিয়ে, মাথার উপরে শূন্যে ঝুলছে হেডসেট।

'উঃ! বাঁচালেন!' শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নাজমুল হুদা। 'গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই আমরা চেষ্টা করছি আপনাকে ফিরিয়ে আনার!'

'কয়েক ঘণ্টা!' ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল। শিউরে উঠে মাথার চুল খামচে ধরল নাসিম। আরে! বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে টাক, ওর মাথাভর্তি চুল! হাত দুটো চোখের সামনে ধরতেই উত্তেজনায় একটা হার্টবিট মিস করল নাসিম। কোথায় গেল ওর বৃদ্ধ শরীরের কুঞ্চিত ত্বক? টানটান সতেজ চামড়ায় ঝকঝকে যৌবন! ফুঁপিয়ে উঠে চেয়ার থেকে নামতে গেল নাসিম, চেপে ধরে রাখল সাবরিনা।

'প্লিজ, শান্ত হোন, স্যার! চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিন,' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল সাবরিনা।

উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে, তারমধ্যেই মাথা ঘুরিয়ে পাশের চেয়ারটার দিকে তাকাল নাসিম। চেয়ারটা শূন্য। কেউ নেই সেখানে। চোখ বন্ধ করে ঢোক গিলল নাসিম। 'সোবাহান···সোবাহান···'

'সোবাহান তো হাসপাতালে!' উত্তর দিলেন মন্ত্রী।

'স্যার, আপনি সোবাহানের জীবন বাঁচিয়েছেন। প্রোগ্রামে না ঢুকলে ওকে বাঁচানো যেত না।' আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে হাসল সাবরিনা।

'জীবন বাঁচিয়েছি! আমি?' বোকার মত এদিক ওদিক তাকাল নাসিম।

'আরে, মশাই, আপনি ছাড়া আর কে?' দেঁতো হাসি মন্ত্রীর গোঁফের নিচে।

'অসম্ভব! এ যে অসম্ভব!'

'স্যার,' অপরাধীর মত চোখ নামিয়ে নিল সাবরিনা, 'বহু চেষ্টা করেও দেড় মিনিটের আগে প্রোগ্রামটা বন্ধ করতে পারিনি। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু প্রোগ্রামটা কিছুতেই বন্ধ হলো না, পুরোটা রান করে তবেই থেমেছে।'

থিরথির করে কেঁপে উঠল নাসিমের ঠোঁটজোড়া। 'মামলা··· শুনানি···শাস্তি···এসব কিছুই হয়নি? সবই অবাস্তব?' মাথা নেড়ে সায় দিল সাবরিনা, চোখে করুণা আর সান্ত্বনা। খপ করে ওর হাতটা ধরে চোখের সামনে তুলে ধরল নাসিম, 'তোমার আঙটি···তোমার বিয়ে··· সবই মিথ্যে?'

'নাসিম সাহেব,' খুশি খুশি গলায় বললেন নাজমুল হুদা, 'দারুণ একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন আপনি। নিজের চোখেই দেখে গেলাম আপনার আশ্চর্য কৃতিত্ব। চিন্তা করবেন না, আপনার এই প্রোগ্রামটা চালু করার জন্যে পার্লামেন্টে আমি নিজেই প্রস্তাব তুলব।'

'কি বললেন?' চীৎকার করে উঠল নাসিম। এক ধাক্কায় মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল নাসিম। দৌড়ে গিয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের উপর। দুহাতে তারগুলো ছিঁড়ছে আর পাগলের মত চীৎকার করছে। ভারী একটা ফাইল ক্যাবিনেট মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে মারল প্যানেলের উপর। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিটের ঝিলিক আর ধোঁয়ার চাঁদোয়া কন্ট্রোল প্যানেল ঘিরে।

ভয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডা. জিনাত আর মন্ত্রী নাজমুল হুদা। সাবরিনা জায়গা থেকে নড়েনি, ল্যাবকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখছে নাসিমের প্রলয়ঙ্করী কাণ্ডকারখানা।

গোলমাল শুনে ছুটে এল দু'জন সিকিউরিটি গার্ড। মন্ত্রী চোখের ইশারা করতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাসিমের উপর। অনেক কষ্টে দু'দিক থেকে চেপে ধরে টানতে টানতে ল্যাব থেকে নাসিমকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে গার্ড দু'জন। ধস্তাধস্তি করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'সাবরিনা! ভেঙে ফেলো অভিশপ্ত এই যন্ত্রটা! নষ্ট করে ফেলো সব ব্লু-প্রিন্ট! আর কাউকে যাতে ভুগতে না হয়···সাবরিনা! আমি ভুল করেছি···আমাকে ক্ষমা করো···সাবরিনা···' ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল নাসিমের আর্তচীৎকার।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে সাবরিনা। অসহায়ের মত চেয়ে রইল খোলা দরজাটার দিকে। তারপর একসময় বিড়বিড় করে উঠল, 'উনি নির্দোষ ছিলেন না...'

এগিয়ে এলেন ডা. জিনাত, ছোট্ট সাদা একটা রুমালে কপালের ঘাম মুছছেন। 'কি বলছ, সাবরিনা?'

'স্যার জানতেন উনি দোষী। জেনেশুনে অপরাধ করেছিলেন। উনি যদি নিজেকে নির্দোষ ভাবতেন, তবে সোবাহানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, সেটা তাঁর বেলাতেও হত। কিন্তু হয়নি। উনি নিজেকে নিজে শাস্তি দিয়েছেন,' সেজন্যেই প্রোগ্রামটা থামানো যায়নি! উনি নিজেই নিজেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন! শুধু তা না, পুরো শাস্তিটাও খেটেছেন!' শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাবরিনা। সামনে অনন্ত জিজ্ঞাসা।

ইরাম

এক

গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরনো একটা ক্যালেন্ডার দেখছিল হাশেম। বিদেশী কোন মোটর প্রস্তুতকারী কোম্পানির ক্যালেন্ডার। পাতায় পাতায় বিভিন্ন ধরনের রঙচঙে গাড়ির ছবি। হাশেম অবশ্য শুধু একটা ছবিই দেখছিল। ভারি সুন্দর চকচকে লাল রঙের একটা ট্রাক। লোভীর মত চেয়ে চেয়ে দেখছে হাশেম। যারা ওকে চেনে, তারা জানে হাশেমের সারাজীবনের স্বপ্ন একটা ট্রাক কেনা। ঢাকা-চিটাগাঙ রুটে চলবে ওর ট্রাক। হিন্দী ছবির নায়কের মত চালকের উঁচু আসনে বসে মনের আনন্দে গান গাইবে, জানালায় সাঁ-সাঁ করে সরে যাবে গাছ-গাছালি ঘেরা গ্রামীণ দৃশ্যাবলী। এই তো জীবন! কিন্তু কবে হবে? গত বছরখানেক ধরে সে চেষ্টা করছে লাইসেন্স বের করবার। ঘুষ-ঘাষ দিয়েও কাজ হয়নি। ধৈর্য ধরে এখনও ট্রেনিঙ নিচ্ছে। হাজী করিম বক্সের চাকরি করেও হাতে অঢেল সময় থাকে। চাকরি আর কি, হাজী সাহেবের সম্পত্তির তদারকি। হাজী সাহেবের দুটো বাড়ি আছে এই গেনডারিয়া অঞ্চলে, কবুতরের খোপের মত ছোট ছোট ফ্ল্যাটে অসংখ্য ভাড়াটিয়া। হাশেমের প্রধান কাজ ভাড়া তোলা আর বিভিন্ন ধরনের বিল আর ট্যাক্স পেমেন্ট করা। মাসের প্রথম ক'দিনই একটু ব্যস্ত কাটে। তারপর বেশীরভাগ সময়ই একতলার সিঁড়ির নিচের জানালাহীন খুপরীর ভেতরে পায়াভাঙা চেয়ার-টেবিলে বসে বসে মাছি মারে হাশেম। এ সময় তার প্রধান কাজ পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে ট্রাকের ছবি দেখা আর যত্ন করে কাঁচি দিয়ে সেগুলোকে কেটে কেটে আঠা দিয়ে দেয়ালে সাঁটা। এই দু'তিন মাসের মধ্যেই ওর চেয়ারের পিছনের নোনা ধরা দাঁত বের করা দেয়ালটা রঙবেরঙের ট্রাকের ছবিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

'কি ব্যাপার? তুমি দেখি এখনও এইখানে বইস্যা আছ!'

চমকে উঠে হাশেম দেখল রুষ্টমুখে হাজী সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। পরনে চিরাচরিত লুঙ্গি-পাঞ্জাবী, মাথায় গোলটুপি। হাতে লাঠি। বাতের ব্যথায় খুব একটা হাঁটাহাঁটি করতে পারেন না তিনি গত ক'বছর। বয়স সত্তরের উপর।

'জ্বী, চাচা, উপরে যাওনের কথা তো? এই তো, যাইতাছি।' আড়মোড়া ভাঙল হাশেম।

'এই তো, যাইতাছি!' মুখ বিকৃত করে ভেঙচি কাটলেন হাজী সাহেব। 'বলি সময় কি তোমার লাইগ্যা বইস্যা থাকব? সারাদিন ধইরা তুমি কোন্ কামটা করলা, হিসাব দাও!'

'অ্যাতো চ্যাতেন ক্যান, চাচা! নয় নাম্বার ঘরটা খালি করনের কথা তো? এক ঘণ্টার মধ্যেই ঝাইড়া-মুইছ্যা পরিষ্কার কইরা দিমু।'

এ বাড়ির তিনতলার নয় নাম্বার ফ্ল্যাটটা গত বিশ বছর ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কাউকে কখনও ওখানে থাকতে দেখা যায়নি। তবে প্রথম পনেরো বছর হাজী সাহেব এ ব্যাপারে মাথা ঘামাননি, কারণ মাসের ভাড়া ঠিকঠাকমতই পেয়ে গেছেন তিনি। গোলমাল শুরু হয় বছর পাঁচেক আগে থেকে। ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দেয় ওরা। ভাড়াটের মতিঝিলের অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। উল্টে ওরা আদালত থেকে ইনজাংশান বের করে আনে। তারপর এতবছর কেস চলেছে। গতকালই হাজী সাহেব কেসে জিতেছেন। আজ তালা ভেঙে ঘর দখল নেবার কথা। হাশেমের মনেই ছিল না।

'বদমাইশ ছ্যামড়া! কামের বেলায় দ্যাখা নাই লম্বা লম্বা কথা!' বিড়বিড় করতে করতে লাঠিতে ভর দিয়ে ফিরতি পথে রওনা হলেন হাজী সাহেব।

'কি কইলেন? আমারে গালি দিলেন?' রাগে শরীরের রক্ত চনমন করে উঠল। বাইশ বছরের সুঠাম শরীরটা ধনুকের ছিলার মত টানটান করে দাঁড়াল হাশেম। হিংস্র দৃষ্টি।

'না, গালি দিমু না, তোমারে চুমা দিমু,' ভেঙচে উঠলেন হাজী সাহেব, 'হারামজাদা নচ্ছার!'

'খবরদার! আমি ভদ্দরলোকের পোলা, গালাগালি করবেন না কইতাছি!'

'কেন, কি করবি? কি করবি তুই আমার?' লাঠিটা শূন্যে তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে ঝাঁকাতে লাগলেন হাজী সাহেব।

সাপের মত শীতল ক্রূর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হাশেম, তারপর হিসহিসিয়ে উঠল, 'আপনের মুখটা কোনমতে বন্ধ কইর‍্যা দিতে পারতাম!'

নুন দেয়া জোঁকের মত গুটিয়ে গেলেন হাজী করিম বক্স। বিড়বিড় করতে করতে পিছু ফিরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন বারান্দা ধরে। লাঠির ঠুকঠুক শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হাশেম যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো। রাগটা এখনও পড়েনি। তবে এ মুহূর্তে চাকরিটা খোয়ানো উচিত হবে না, সে জ্ঞানটা আছে। নিজের জন্যে চিন্তা করে না হাশেম, কিন্তু সতেরো বছরের হাবাগোবা ভাইটার দায়িত্ব ওর কাঁধের উপর। ছেলেবেলায় কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে পা দু'টি শুকিয়ে যায় কাশেমের, জন্মের মত পঙ্গু হয়ে যায় ছেলেটা। বুদ্ধিতেও জবুথবু। পৃথিবীতে এই ভাইটা ছাড়া আর কেউ নেই হাশেমের। ভাইয়ের কথা মনে হলেই মায়ায় বুকের ভেতরটা ভিজে ওঠে। যদি টাকা জমিয়ে সত্যি সত্যি একটা ট্রাক কিনতে পারে কোনদিন, তাহলে আর ওদের কষ্ট থাকবে না। বড় ডাক্তার দেখিয়ে কাশেমের চিকিৎসা করাবে।

তিনতলায় মোট পাঁচটা ফ্ল্যাট। একটা বা দুটো করে ঘর এক একটা ফ্ল্যাটে। পুরনো বাড়ি। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। হাজী সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে এ বাড়িরই একতলায় থাকেন। নয় নাম্বার ফ্ল্যাটটা বারান্দার একধারে। লোহার রড দিয়ে দু'তিনবার চাড় দিতেই পচধরা দরজার গা থেকে কড়া সহ তালাটা খুলে এল। দরজার পাল্লা ঠেলে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল হাশেম।

একমাত্র জানালাটা বন্ধ, ফলে এই ভরদুপুরেও ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। ঘরটা বড় নয়, পনেরো বাই বিশ কি আর একটু বেশী। মাকড়সার জাল আর ঝুলে মোড়া কিছু আসবাবপত্র ডাঁই করে

রাখা। বিশ বছরের পুরনো ভ্যাপসা ভারী বাতাস।

জানালাটা খোলার চেষ্টা করল হাশেম; পারল না। আটকে আছে শক্ত হয়ে। ট্রেট্রনের প্যান্ট গুটিয়ে নিল একটু। গায়ের চেককাটা শার্টটা খুলে রাখল রেলিঙের গায়ে।

আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। গোটাকয়েক পুরনো ধরনের চেয়ার, সাইড টেবিল, আর আয়না। দামী জিনিসপত্র, দেখেই বোঝা যায়। টেপ আঁটা কয়েকটা কাডবোর্ডের বাক্সও আছে। একটা খোলা বাক্সে কাগজপত্র, কয়েকটা খাতা-বই। ঘরের ঠিক মাঝখানে গোল করে মুড়ে রাখা একটা কার্পেট। একটু অবাক হলো হাশেম, কার্পেটটা প্রায় নতুনের মত দেখাচ্ছে। একটু ঝুল কি মাকড়সার জাল কিছুই নেই। আশ্চর্য তো! বিশ বছরেও একটু ধুলো জমতে পারেনি!

উবু হয়ে কার্পেটের একপ্রান্ত ধরে তুলে ফেলল হাশেম। টানতে যাবে, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হলো। কি যেন একটা নড়েচড়ে উঠল কার্পেটের ভেতর! ভয়ে কার্পেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই লাফে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল হাশেম। শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কার্পেটের দিকে।

কই, আর তো নড়ছে না! তবে কি মনের ভুল? তাই হবে হয়তো। দরজা-জানালা বন্ধ ঘরে বিড়াল কি অন্য কোন জানোয়ার ঢোকার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিশ বছর ধরে ঘরটা বন্ধ অবস্থায় আছে।

পায়ে পায়ে কার্পেটের পাশে এসে দাঁড়াল হাশেম। নিরাপদ দূরত্বে থেকে কার্পেটের প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। গড়িয়ে খুলে গেল কার্পেট। ভূত দেখার মত চমকে উঠল হাশেম। ঘাড়ের পিছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে।

কার্পেটের ঠিক মাঝখানে শোয়া থেকে উঠে বসেছে অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী। ধবধবে ফর্সা। কালো একটা পোশাক জড়িয়ে পরা। একমাথা কালো চুল কার্পেট ছুঁয়ে আছে। কাজলটানা বড় বড় চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি, আগ্রহ নিয়ে দেখছে হাশেমকে। টকটকে লাল লিপস্টিকচর্চিত ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসির আভাস। আবছা আঁধারেও ডান চোখের ঠিক নিচে হীরের মত জ্বলজ্বল করছে মেয়েদের কপালে পরার টিপের মত দেখতে একটা বিন্দু।

হতভম্বের মত চেয়ে রইল হাশেম।

'কি চাও?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'অ্যাঁ?' চমক কাটল হাশেমের, বিড়বিড় করে বলল, 'হাজী করিমের মুখটা যদি বন্ধ করতে পারতাম।' পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'কে আপনি?'

'আমি?' হাসল মেয়েটা। 'আমি ইরাম। পূর্ণ হবে তোমার ইচ্ছে।'

ওদিকে নিচতলায় হাজী করিম বক্স তখন জোহরের নামাজ আদায় করতে দাঁড়িয়েছেন জায়নামাজে। সময় নিয়ে নামাজ শেষ করলেন তিনি। তসবীহ্ গুনলেন নিয়ম মত। টেবিলে ভাত দেয়া হয়েছে কিনা জানার জন্যে কাজের ছেলেটাকে ডাকলেন, 'ওরে···' ব্যাপার কি? গলার ভেতরে গোঙানির মত শব্দ উঠছে, কিন্তু কথা বের হচ্ছে না! প্রাণপণ চেষ্টা করেও হাঁ করতে পারলেন না হাজী সাহেব। খোদা! হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে নাকি? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডান হাতে মুখটা ছুঁলেন। এবারে সত্যি সত্যি হার্ট অ্যাটাক হবার উপক্রম হলো। মুখ কোথায় গেল? আঙুলের নিচে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি নিরেট চামড়া। মুখটা খুঁজে পাচ্ছেন না! ও আল্লাহ্! মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না তো! গোঙাতে গোঙাতে কোনমতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হাজী সাহেব। লাঠির কথা ভুলে ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে বাথরুমের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাবার মত চেয়ে রইলেন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

নাকের নিচে দাড়ি-গোঁফে ছাওয়া নিরেট চামড়া। ঠোঁটের কোন চিহ্নই নেই! ঠোঁটজোড়া যেন কোনদিনই ওখানে ছিল না!

দুই

পরদিন বিকেল সাড়ে চারটায় হাজী সাহেবকে বসে থাকতে দেখা গেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ আশিকুল ইসলামের অফিসে। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় এই

একদিনের মধ্যেই শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছেন হাজী সাহেব। গতকাল সন্ধ্যায় হাসপাতালের সার্জন ইমার্জেন্সি অপারেশন করে ঠোঁটের জায়গাটা কেটে ফাঁক করে দিয়েছেন যাতে কোনমতে খাওয়া আর কথা বলার কাজ চলে। কাটা জায়গাটা ব্যান্ডেজ করা, সেলাই দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। বীভৎস দেখাচ্ছে।

হাজী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে মাওলা বক্স আছেন, তিনিই কথাবার্তা যা বলার বলছেন। 'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আব্বা সোজা এখানে চলে এলেন, কিছুতেই বাসায় নিতে পারলাম না।' ইতিমধ্যে হাজী সাহেব দু'হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন, ভালমত কিছু বোঝা গেল না। মাওলা বক্স তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, 'আপনি একটু চুপ করে বসেন তো, আব্বা। আমি সবই ওঁকে বলব। ডাক্তার একদম নিষেধ করে দিয়েছেন ঘা শুকাবার আগে যাতে কথা না বলেন।'

'কিন্তু আমাকে আপনারা চিনলেন কেমন করে?' সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসা সুদর্শন আশিকুল ইসলাম চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল। এধরনের কেসের কথা সে জন্মেও শোনেনি।

'আব্বার পরামর্শমত হাসপাতালের ওরা থানায় খবর দিয়েছিল। কিন্তু ওরা কেস নিতে রাজী হয়নি। যথেষ্ট প্রমাণ নাকি নেই। ওই থানারই এক ইন্সপেক্টর আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলল। আপনি নাকি ভৌতিক কেস পেলে খুব খুশি হন।'

সুন্দর একসারি দাঁত দেখিয়ে হেসে ফেলল আশিক। 'ঠিক ভূত-প্রেত নয়, তবে প্যারাসাইকোলজী সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আছে। তাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনবোধে প্রায়ই আমাকে স্মরণ করে। তবে আপনাদের কেসটা আমার খুব ইন্টারেসটিং মনে হচ্ছে। আচ্ছা, একজ্যাক্টলি কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, আবার একটু বলবেন?'

হাজী সাহেব উত্তেজিত হয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন, মাওলা বক্স হাত বাড়িয়ে তাঁকে সামলালেন। 'আমি বলছি তো, আপনি শান্ত হয়ে বসেন। বুঝলেন, আব্বা দুপুরবেলা এক কর্মচারীকে একটু বকাঝকা করে নামাজ পড়তে বসেন। তারপর নামাজ শেষ করেই দেখেন এই অবস্থা। মুখের জায়গাটাই গায়েব।' হাজী সাহেব আবার গুঙিয়ে

উঠলেন। মাওলা বক্স খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে একবার পিতার দিকে তাকালেন। তারপর নিচুস্বরে বললেন, 'আব্বার ধারণা ওই কর্মচারীই কোনভাবে এটা করেছে!'

'বলেন কি! কিন্তু কেন উনি তাকে সন্দেহ করলেন?'

'কারণ কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছেলেটা নাকি বলেছিল, "যদি আপনার মুখটা বন্ধ করে দিতে পারতাম!" তারপরেই তো এই অবস্থা! মুখটা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল।'

'হুঁ!' ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল আশিক। 'আপনি একটা কাগজে আপনাদের এই কর্মচারীর নাম-ঠিকানা আর আপনাদের নাম-ঠিকানা-ফোন নাম্বার লিখে দিয়ে যান। হাসপাতালের সার্জনের নামটাও।'

'আপনার ফি...'

'সেটা পরে দেখা যাবে। আমার সেক্রেটারি তো আগেই আপনাদের বলেছে আমার স্ট্যানডার্ড ফি কত। তবে এক্ষেত্রে আমার কাছে আপনারা ঠিক কি সার্ভিস আশা করে এসেছেন, না জেনে আমি কোন ফি নেব না।'

'আব্বা শুধু জানতে চান হাশেম কি করে ব্যাপারটা ঘটাল। তারপর ওর যা শাস্তি...'

'যদি ও সত্যিই ঘটিয়ে থাকে। তবে শাস্তি দেয়া তো আমার কাজ নয়। দেখি, দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করব। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা। ঠিক কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, জানেন?'

'হ্যাঁ, আমি তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমাদের তিনতলার এক ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কেস হচ্ছিল বহুদিন ধরে। কেসটা আমরা জিতে যাই। আব্বা হাশেমকে বলেছিল সকালের মধ্যেই যাতে ঘরটার তালা ভেঙে ভেতরের জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেয়। কিন্তু হাশেম গা করেনি। এ নিয়েই ঝগড়া।'

'আচ্ছা! ওই ভাড়াটে এখন কোথায়?'

'ওরা তো কখনোই ওই ফ্ল্যাটে ছিল না। শুধু কয়েকটা জিনিসপত্র ভরে তালা দিয়ে গিয়েছিল। মতিঝিলের এক অফিস থেকে মাসে মাসে

ভাড়ার টাকা নিয়ে আসতাম আমরা।'

'ওই ঠিকানাটাও দিয়ে যান আমাকে। আর হ্যাঁ, ঝগড়ার পরে হাজী সাহেবের যখন এই অবস্থা, হাশেম তখন কোথায় ছিল?'

'তিনতলায় ওই ঘরটা পরিষ্কার করছিল। আব্বাকে নিয়ে আমরা তখন পাগলের মত হাসপাতালে ছুটেছি। হাশেম কখন চলে গেছে কেউ দেখেনি। তবে আজ সকালে সে আর কাজে আসেনি। সেজন্যেই সন্দেহটা আরও বেশি হচ্ছে, ওর হাত না থেকেই পারে না।'

'আমি দেখছি কি করা যায়।' উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল আশিক। বিদায় নিয়ে বাপ-ব্যাটা বেরিয়ে গেল। নাম-ঠিকানা লেখা কাগজটা যত্ন করে ওয়ালেটে রেখে দিল আশিক।

অস্থির পায়ে বার বার জানালায় গিয়ে উঁকি দিচ্ছে হাশেম। জংধরা শিকের জানালায় কোন পর্দা নেই, কাঠের পাল্লা দুটো ভেতর থেকে টেনে দেয়া। তবে একদম বন্ধ নয়। মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এ বাড়ির ঠিক সামনে গলিজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে নতুন একটা ট্রাক।

ছোট্ট এই ঘরটাতে হাশেম তার ভাইকে নিয়ে থাকে। দশ ফুট বাই বারো ফুটের এই ঘরেরই এককোণে রান্নার ব্যবস্থা। গ্যাস আছে বলেই একটু বেশি ভাড়া হলেও কিছু মনে করেনি হাশেম। বাথরুম আর গোসলের ব্যবস্থা এজমালী। এ বাড়ির পিছন দিকে প্রায় শ'খানেক ভাড়াটের জন্যে দুটো বাথরুম করা আছে। ভাড়াটেদের বেশীর ভাগই সরকারী-বেসরকারী অফিসের পিওন-দারোয়ান-ড্রাইভার। হাশেমের ঘরটা একতলার এক কোণে।

আর একবার জানালার ফাঁক দিয়ে ট্রাকটার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল হাশেম, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে উঠল, 'এখন আমি কি করি? উহ্! খোদা! এত বিপদেও মানুষ পড়ে!'

পিছনে দেয়ালের গায়ে হেলান দেয়া সুন্দরী মেয়েটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'তবে তুমি চাইলে কেন? যা চেয়েছ, তাই পেয়েছ। আমার কি দোষ?' সেই একই আলখাল্লা টাইপের কালো পোশাক পরনে, কপাল থেকে চুলের অরণ্যে উঠে গেছে সরু সাদা সিঁথি। শঙ্খের মত শুভ্র পেলব ত্বক।

'আরে, তখন কি আর এত কিছু চিন্তা করছি?' উদ্ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাল হাশেম। উস্কখুস্ক মাথার চুল, চোখের নিচে কালি। গতকাল থেকে হাশেমের নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। পরনে গতকালকের সেই বাদামী ট্রেট্রনের প্যান্ট আর চেক শার্ট। 'কাগজপত্র ছাড়া এই ট্রাক দিয়া কি হবে? এখন তো চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হওনের জোগাড়! যদি পুলিশে আইস্যা ধরে? যদি কয় চোরাই ট্রাক? এইটা রাখিই বা কোথায়? এইখানে তো আর রাখা যায় না!'

ভুরু কোঁচকাল সুন্দরী, 'তার আমি কি জানি? চাওয়ার সময় মনে ছিল না? তবে এখনও তোমার একটা চান্স আছে, চাইলে ট্রাকটা গায়েব করে ফেলতে পারি।'

প্রায় ককিয়ে উঠল হাশেম, 'না না না! শেষ চান্সটা আমি এইভাবে নষ্ট করতে চাই না! আহাম্মকের মত প্রথম দুটো চান্স নষ্ট করছি! তখন তো বিশ্বাসই করি নাই! শেষ ইচ্ছাটা চিন্তাভাবনা কইরা ঠিক করুম।'

ঘরের একমাত্র চৌকিটার উপর বসে থাকা কাশেম এতক্ষণে নড়েচড়ে উঠল। একগাল হেসে বলল, 'ভাইজান, আমিও খুব কইরা চিন্তা করতাছি আর কি চাওন যায়।'

ওর দিকে তাকাল না হাশেম, আবার জানালার ফাঁকে চোখ রাখল। আঁৎকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রাকের ঠিক সামনে সাদা একটা টয়োটা স্টারলেট এসে দাঁড়িয়েছে। বছর ত্রিশেকের সুপুরুষ এক যুবক গাড়ি থেকে নেমে এল। জিন্স্ আর সাদা শার্ট পরনে। স্মার্ট ভঙ্গিতে কোমরে হাত রেখে ট্রাকটা দেখছে। লম্বা-চওড়া পেটা শরীর।

'খাইছে!' ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার মত অবস্থা হলো হাশেমের। 'এই ব্যাটা পুলিশের লোক না হইয়াই যায় না। হায় হায়! এখন কি হইব!' এদিকেই আসছে যুবক। দরজার গায়ে কয়লা দিয়ে লেখা নম্বরটা পড়ল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে উঠে এল সিঁড়িতে। আর দেখল না হাশেম, একলাফে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল, ইঙ্গিতে কাশেমকে মুখ খুলতে নিষেধ করল।

'কেউ আছেন বাড়িতে?' বাইরে থেকে ডাকল যুবক, 'হাশেম মিয়া?'

'ভাইজানে বাসায় নাই!' আতঙ্কিত কাশেম উত্তর দিল ভেতর

থেকে।

'দরজাটা একটু খুলবেন? জরুরী কথা আছে।'

নিরুপায়ের মত মেয়েটার দিকে চাইল কাশেম, সে মনোযোগ দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটছে। হাশেম চৌকির তলায় অদৃশ্য। খাট থেকে নেমে বসা অবস্থায় মেঝেতে পা দুটো টেনে টেনে দরজার গোড়ায় এল কাশেম, খুট করে খুলে দিল ছিটকিনি।

অবাক হলো আশিক। পঙ্গু এক কিশোর বসে আছে মেঝেতে দরজার পাল্লায় হাত রেখে। হাতাকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরনে। 'তুমি কে? হাশেম মিয়ার ভাই?'

উপর-নীচ মাথা নাড়ল কাশেম, ঢোক গিলল। কি ব্যাপার? এত নার্ভাস হয়ে আছে কেন ছেলেটা? এক পা এগিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল আশিক, 'হাশেম মিয়া কখন ফিরবে বলতে পারো?' বলতে বলতেই থ হয়ে গেল আশিক। চৌকির পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। লম্বা কালো পোশাক পরনে, ছেড়ে দেয়া লম্বা চুলের সাথে এক হয়ে গেছে। পানপাতার মত মুখ, তুলিতে আঁকা চোখ-নাক। ডান চোখের নিচে জ্বলজ্বল করছে ছোট্ট তিলের মত একটা টিপ। ছুরির মত ধারাল ব্যক্তিত্ব। শিরশির করে উঠল বুকের ভেতরটা। কে এই মেয়ে? এই জায়গায় এই ঘরে কিছুতেই একে মানাচ্ছে না।

'ভাইজান কখন ফিরব জানি না।'

নিজেকে সামলে নিল আশিক। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, 'ফিরলে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো। খুব দরকার।' আর একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে এল আশিক। আশ্চর্য! এই ঘরে এই মেয়ে কি করছে?

গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে এল হাশেম। হাততালি দিয়ে উঠল কাশেম, 'বোকা বানাইছি! ব্যাটারে বোকা বানাইছি!'

হাসল হাশেম, 'খুব ভাল দেখাইছত। এখন চিন্তাভাবনা কর তো, কি চাওন যায়?'

'ভাইজান, আমি কই কি, ট্যাকা চাও। এক লাখ ট্যাকা!' জ্বলজ্বল

করছে কাশেমের চোখ দুটো।

'দূর বোকা! এক লাখ ট্যাকায় আর কয়দিন চলব আমাগো?'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আশ্চর্য! তোমরা যে এত বোকা! টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছু তোমাদের মনে পড়ে না? অবাক কাণ্ড!'

'টাকা ছাড়া আর কি এমন দরকার হয় আমাগো?' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল হাশেম।

ধৈর্য হারিয়ে দু'পা এগিয়ে এল মেয়েটা, মমতামাখা দীঘল চোখে চাইল কাশেমের পঙ্গু পা দুটোর দিকে। আস্তে করে বলল, 'টাকা ছাড়া আরও কত কি চাওয়ার আছে, মনে করে দেখো তো!'

চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল হাশেম, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। 'ঠিক কথা! ট্যাকা না। ক্ষমতা দরকার। ট্যাকায় ক্ষমতা হয়। ক্ষমতা থাকলে ট্যাকা আপনিই আইয়া পড়ব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সুন্দরী। আনমনে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা। তবে কি ধরনের ক্ষমতা পরিষ্কার করে বলো। আমি চাইলে কি হবে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভাল চাও না।'

কান দিল না হাশেম, নিজের মনেই চিন্তা করছে আর বাঁ হাতে মাথার চুল টানছে। হঠাৎ ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একলাফে এসে দাঁড়াল ওর অপরূপা অতিথির মুখোমুখি। 'পাইছি! মার দিয়া কিল্লা! আমারে অদৃশ্য কইরা দাও।'

আঁৎকে উঠল কাশেম, 'কি কও, ভাইজান? ট্যাকা চাও, ট্যাকা।'

'আরে বোকা, বুঝস্ না ক্যান? যদি আমি গায়েব হইয়া যাই...মানে কেউ যদি আমারে দেখতে না পায়, তাইলে যত ইচ্ছা ট্যাকা আমি পাইতে পারি।' কাশেম তখনও হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে দিগ্বিজয়ীর মত হাসল হাশেম, 'চিন্তা কইরা দ্যাখ্, কেউ আমারে দেখতে পাইতেছে না। আর আমি হগলের নাকের ডগা দিয়া দোকানে ঢুইক্যা যা খুশি তুইলা নিয়া আসতাছি! সোনা-গয়না মণি-মাণিক্য সব! ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বোন্দা নিয়া আসুম, কেউ টেরও পাইব না! যা খুশি তাই করুম, কেউ ধরতে পারব না!'

খুশিতে ডগমগ করে উঠল কাশেম, 'হ, সেইটাই ভালা। যখন যা দরকার, নিয়া আসবা। কেউ তো দেখব না।'

বুকে হাত বেঁধে মাথাটা একটু কাৎ করে দু'ভাইয়ের কথোপকথন শুনছিল মেয়েটা। আস্তে করে বলল, 'তাহলে এটাই ঠিক করলে? অদৃশ্য হয়ে যেতে চাও? নাকি আর একটু চিন্তা করে দেখবে? তাড়াহুড়ার কিছু নেই।'

'না,' আগ্রহে জ্বলছে হাশেমের চোখজোড়া, 'আর কিছু চিন্তা করনের নাই। আমারে অদৃশ্য কইরা দাও।'

'ঠিক তো? এটাই কিন্তু শেষ চান্স।'

'জানি জানি, মনে আছে।' অধৈর্য হয়ে দু'হাত ঝাঁকাল হাশেম। 'এখন তাড়াতাড়ি করো।'

ম্লান হাসির ভঙ্গিতে লাল ঠোঁটজোড়া একটু বেঁকে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা। তৈরি?'

'হ্যাঁ, তৈরি।' বুক ভরে শ্বাস টেনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল হাশেম।

সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা, ধীরে ধীরে চোখ বুজল। পরক্ষণেই ঝিকমিক করে উঠল ওর চোখের নিচের রুপোলী বিন্দুটা।

হতভম্ব কাশেমের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল হাশেম। প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও ভয় পেল ছেলেটা, 'ভাইজান!'

দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট শোনা গেল হাশেমের কণ্ঠস্বর, 'কই? সত্যিই আমি অদৃশ্য হইছি? দেখি তো!' ধুপধাপ শব্দ হলো পায়ের, বোঝা গেল হাশেম দেয়ালে ঝুলানো দাড়ি কামানোর আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'বাহ্! সত্যিই তো! একদম অদৃশ্য! বা রে বা, কি মজা!'

ভাইয়ের খুশি উপলব্ধি করে কাশেমও হাসতে শুরু করেছে। হাশেমকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। চলাফেরার শব্দেও বোঝা যাচ্ছে ওর অবস্থান। ধুপধাপ পদশব্দ দরজার দিকে এগিয়ে গেল, খুলে গেল দরজাটা হাট হয়ে। দরজার বাইরে সিঁড়ির উপর ভাঙা একটা মোড়া ছিল। শূন্যে উঠে গিয়ে সামনের রাস্তায় ছিটকে পড়ল ওটা। ঘরের ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে হাশেমের চীৎকার, 'ধর্ তো দেখি আমারে, কে কোথায় আছস্! কি মজা রে ভাই,

কি মজা!' গলির পাশে দেয়াল ঘেঁসে আগাছার জঙ্গল, মট্ করে তার একটা পাতলা ডাল ভেঙে গেল। বাতাসে ভর করে নাচতে নাচতে ডালটা এগিয়ে চলল। ডাস্টবিনের ময়লা ঘাঁটছিল ছালউঠা একটা নেড়ী কুকুর। বিনা নোটিশে কুকুরটার পিঠে আছড়ে পড়ল পাতাভর্তি ডালটা। 'কেঁউ' করে কুঁকড়ে গেল কুকুরটা। 'হোঃ হোঃ হোঃ' করে কেউ হাসছে, কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে ভয় পেল কুকুরটা। কান খাড়া করে দুপা পিছু হটল, তারপর চোঁচা দৌড়। হাসির শব্দটাও যাচ্ছে ওর পিছু পিছু। আশেপাশের বাড়ির লোকজন এবং ব্যস্ত পথচারীরা কিছুই লক্ষ্য করল না। শুধু কাশেম উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল জানালায় যতদূর চোখ যায়।

গলির মাথায় লোকজনের ভীড়। বড় রাস্তার মোড়। সাবধানতাবশত নিঃশব্দে ভীড়ের গা বাঁচিয়ে এসে দাঁড়াল হাশেম। ব্রিফকেস হাতে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সাফারি পরা এক লোক। এখন যদি এই লোকের ব্যাকপকেট থেকে মানিব্যাগটা ও তুলে নেয়, কেউ দেখতে পাবে না! আনন্দে ছটফট করছে হাশেম। উঃ! কি আনন্দ! কি করবে না করবে ভেবে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। ছুঁচোর মত দেখতে এক লোক বাঁ হাতে লুঙ্গি তুলে ডান হাতে পাছা চুলকাচ্ছে। কষে একটা চড় লাগালে কেমন হয়? ভাবতে গিয়ে পেট ফেটে হাসি পেল। না, এখন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা উচিত হবে না।

হঠাৎ রাস্তার উল্টোদিকে চোখ গেল। ভারি সুন্দর দুটো মেয়ে রিকশা ঠিক করছে, পরনে স্কুলেব ড্রেস। এখন যদি ওদের গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ায়, ওরা কিছুই টের পাবে না! হাশেমের গায়ের অদৃশ্য রক্ত চনমন করে উঠল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ব্যস্ত রাস্তায় পা দিল হাশেম, সব মনোযোগ স্কুলছাত্রী দু'জনের দিকে।

ব্যস্ত রাজপথে পূর্ণগতিতে ধেয়ে আসছিল একটা ট্রাক, ড্রাইভার আচমকা ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কিছু একটার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিসের সঙ্গে? থ্যাচ্ করে শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করেছে ড্রাইভার, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তবে কি ট্রাকের তলায় চলে গেল? দুরুদুরু বুকে ট্রাক ছেড়ে নেমে এল মধ্যবয়সী ড্রাইভার, উবু হয়ে ট্রাকের তলায় উঁকি দিল। কিন্তু কই, কিছুই তো

নেই! ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

ওদিকে বিশ পঁচিশ ফিট দূরে রাস্তার উপর ভীড় জমে উঠেছে। কি দেখছে লোকগুলো? ওখানে তো কিছুই ছিল না! কৌতূহল মেটাতে সেদিকে এগিয়ে গেল ড্রাইভার। আরে, এযে আহত মানুষের গোঙানি! হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাহলে সত্যিই কাউকে ধাক্কা মেরেছে ওর ট্রাক! ভীড় ঠেলে মাঝখানের খালি জায়গায় উঁকি দিল ড্রাইভার। কই, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

ঘিরে দাঁড়ানো পথচারীরা নিজেদের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত। দেখে মনে হয় লোকগুলো ভয় পেয়েছে। আহত মানুষের গোঙানি এখনও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'কি হইছে, কন তো? চিল্লায় কে?' গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

উবু হয়ে বসা গলায় লাল মাফলার জড়ানো একটা লোক ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'লোকটারে দেখা যাইতাছে না, কিন্তু চিল্লানি শুনতাছি আমরা। দ্যাখেন, হাত দিয়া দ্যাখেন, ধরা যায়! এইখানে হুইয়া আছে। অ্যাক্সিডেন হইছে!'

'ভূত নাকি, মিয়া?' পরিহাসছলে আর একজন টিপ্পনী কাটল।

উবু হয়ে ধীরে ধীরে হাত বাড়াল ড্রাইভার, লাল মাফলারের নির্দেশিত জায়গায়। পরমুহূর্তে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো! রাস্তার উপরে শুয়ে থাকা লোকটাকে ছোঁয়া যাচ্ছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, দেখা যাচ্ছে না!

তিন

ঠিকানা ধরে গেন্ডারিয়ায় হাজী সাহেবের বাড়ি খুঁজে বের করল আশিক। সকাল আটটা বাজে প্রায়। অফিসে যাবার আগেই ঢুঁ মেরেছে এখানে। হাজী সাহেবকে অষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মাওলা বক্সের সঙ্গে তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে এল আশিক।

'আগের তালাটা ভেঙে ফেলাতে এটা নতুন লাগানো হয়েছে। আসেন, ভেতরে আসেন। সেদিনের পর থেকে কেউই এখানে আসে নাই।' তালা খুলে দরজাটা ঠেলে দিল মাওলা বক্স।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখে নিল আশিক। পুরনো ধুলোমাখা আসবাবপত্রের স্তূপ, বাক্সে বইপত্র-আবছা অন্ধকারেও কিছুই চোখ এড়াল না। এগিয়ে গিয়ে জানালা খোলার চেষ্টা করল মাওলা বক্স, কাজ হলো না।

'বাতিটা নাহয় জ্বালিয়ে দিন,' বলল আশিক।

'আরে, এই ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক লাইন কেটে দেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে।'

'তাহলে ব্যস্ত হবেন না। বেশ দেখা যাচ্ছে এই আলোতেই।' একটা দেরাজের হাতল ধরে টান মারল আশিক, খালি। নিচের দেরাজে জংধরা একটা কাঁচি, আর কিছু নেই। কাজ করতে করতেই আশিক বলল, 'গতকাল বিকালের দিকে হাশেমের বাসায় গিয়েছিলাম, সে বাসায় ছিল না। তারপর গেলাম মতিঝিলে, আপনারা যেখান থেকে ভাড়া আনতে যেতেন। ভদ্রলোকের নাম আবু নাসের, একটা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কোম্পানিতে চাকরি করেন। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না, অফিস শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন। বাড়ির ফোন নাম্বারটা নিয়ে এসেছিলাম। রাতে ফোনে কথা হলো আবু নাসের সাহেবের সঙ্গে।'

'ও।' তেমন উৎসাহ দেখাল না মাওলা বক্স।

একতাড়া চিঠিপত্র আর কাগজ তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগল আশিক। 'ভদ্রলোককে বেশ ভালমানুষ বলে মনে হলো। এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছিলেন উনিই, তবে নিজের জন্যে নয়।'

'তবে কার জন্যে?' অবাক হলো মাওলা বক্স।

'এই জিনসপত্র-ফার্নিচার সবই নুরুল আফসার নামে এক ভদ্রলোকের। বিশ বছর আগে আবু নাসের চাকরি করতেন এই নুরুল আফসারের অধীনে, প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে। নুরুল আফসার সম্বন্ধে তেমন কিছু উনিও জানেন না। যতদূর জানা যায়, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী ছিলেন। কিসের ব্যবসা, তা উনিও ভাল করে জানতেন না।

তবে নাসের সাহেব যা বললেন, এই নুরুল আফসার বগুড়া থেকে ঢাকায় আসেন তার মাস ছয়েক আগে। তখন উনি বিরাট ধনী লোক। অথচ বগুড়ায় থাকাকালীন উনি ছিলেন ছাপোষা এক কেরানী। হঠাৎ কেমন করে এত পয়সাকড়ি হাতে এল, তা এক রহস্য। মানুষের ধারণা, নুরুল আফসার লটারি জিতেছিলেন। যাই হোক, ঢাকায় এসে মগবাজার অঞ্চলে অভিজাত একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেন তিনি। তারপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেক্রেটারি হিসেবে আবু নাসেরকে চাকরিতে নেন।'

'নুরুল আফসার এখন কোথায়? তার মালপত্রই বা কিভাবে এখানে এল?'

'বলছি। মগবাজারের ফ্ল্যাটে উঠার পরে গুলশানে দশ কাঠা জমি কেনেন তিনি। তারপর সে জমিতে আলিশান এক বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেন। তবে ফাউনডেশন শেষ হবার পরপরই নুরুল আফসার মারা যান। আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে আবু নাসের জানতেন না। বগুড়ায় অনেক খুঁজেও কাউকে পাননি। উপায়ান্তর না দেখে ভাড়া কম দেখে আপনার এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেন আবু নাসের। মগবাজারের ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে নুরুল আফসারের মালপত্র সব নিয়ে আসেন এই ঘরে। এটা স্টোর হিসেবে ব্যবহার করেছেন উনি। নুরুল আফসারের কিছু ক্যাশ টাকা ছিল আবু নাসেরের কাছে, তা দিয়েই এতদিন এই ঘরের ভাড়া শোধ করতেন। আশা ছিল, নুরুল আফসারের কোন আত্মীয়-পরিজন দাবি করলে মালপত্র সব বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু এত বছরেও কেউ আসেনি। টাকা ফুরিয়ে যেতে এ ঘরের ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দিলেন এক সময়ে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার!' আনমনে বলল মাওলা বক্স। 'সাধারণত বড় লোকদের তো লতায়পাতায় অনেক আত্মীয় বের হয়! তা উনার গুলশানের সম্পত্তির কি হলো?'

'কারা যেন দখল করে নিয়েছে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করে দেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে। তবে আবু নাসের লোকটা খুবই সৎ বলে মনে হয়। বললেন, নুরুল আফসারের ব্যবহার করা কয়েকটা দামী জিনিস উনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, কোন উত্তরাধিকারী

দাবি করলে অবশ্য দিয়ে দেবেন।' কথা বলতে বলতেই মালপত্র উল্টেপাল্টে দেখছিল আশিক। প্যাকিঙ বাক্সের কাগজপত্রের মধ্যে হলদে একটা খাম দেখে তুলে নিল। ভেতরে পুরনো কয়েকটা ছবি। আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মোট পাঁচটা ছবি। টেকোমাথা প্রকাণ্ড এক লোক পাঁচটা ছবিরই মধ্যমণি, ডাব্‌ল্-ব্রেস্টেড সাদা সুট পরনে, দু'হাতের আঙুলে অনেকগুলো আঙটি। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হলো না, আশিক বুঝল এই লোকই নুরুল আফসার। কোন ডিনার পার্টির ছবি। নুরুল আফসারের আশেপাশে অনেক লোক! কারও কারও হাতে পানপাত্র, কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত। সবাই বেশ হাসিখুশি। জমজমাট পার্টি। ছবিগুলো ভাল করে দেখতে যেতেই চমকে উঠল আশিক। প্রতিটা ছবিতেই নুরুল আফসারের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। সুন্দরী, কালো পোশাক পরনে। ভীষণ পরিচিত চেহারা। কে এই মেয়েটা? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল। আরে! এই মেয়েটাই তো গতকাল হাশেমের বাসায় ছিল! সেই একই চুল, একই চোখ, একই পোশাক! কিন্তু কি করে তা হয়? এ ছবিগুলো কম করেও বিশ বছর আগে তোলা। এতদিনে ছবির এই মেয়েটার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে যাবার কথা। অথচ গতকাল যাকে আশিক দেখেছে, তার বয়স বিশ/বাইশের বেশি কিছুতেই না।

'কি হলো, আশিক সাহেব, কিসের ছবি ওগুলো?'

চমক ভাঙল আশিকের। দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। 'নুরুল আফসারের ছবি, মানে যতদূর মনে হয় আর কি। আপনি আপত্তি না করলে ছবিগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই।'

'কিসের আপত্তি? নিয়ে যান যা ইচ্ছা। এসব জিনিসপত্র এমনিতেই তো ফেলে দেব আমরা।'

'না না, এখন কিছু করবেন না। কয়েকটা দিন দেরি করুন। কাউকে এঘরে ঢুকতে দেবেন না আপাতত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আশিক। যত্ন করে ছবিগুলো বুকপকেটে রেখে দিল।

'আচ্ছা, নুরুল আফসার মারা গেলেন কি ভাবে?' জানতে চাইল মাওলা বক্স।

ম্লান হাসল আশিক, ঝড়ের বেগে মাথার ভেতর চিন্তা চলছে। 'খুব করুণ মৃত্যু। মাতাল অবস্থায় মগবাজারের আটতলার ফ্ল্যাট থেকে ঝাঁপ দেন। তাৎক্ষণিক মৃত্যু।'

'আহ্‌হা!' দুঃখ করল মাওলা বক্স। 'এত টাকা-পয়সা, ভোগ করতেই পারল না বেচারা!'

বিদায় নিয়ে অফিসে চলে এল আশিক।

চার

অফিসের ঠিক সামনেই পুলিশের জীপ পার্ক করা। গাড়ির দরজা লক করতে করতে আশিক চিন্তা করার চেষ্টা করল কেসটা কি। খুব আজগুবি কিছু না হলে পুলিশ ওকে স্মরণ করে না। উপরে এসে দেখল, ইন্সপেক্টর রুমা মজুমদার বসে আছে ওর অপেক্ষায়। খুশি হলো আশিক। শুধু দেখতে ভাল বলে নয়, ভারি অমায়িক সহজ ব্যবহার মহিলার। এই দু'বছরে প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে এসেছে ওদের দাপ্তরিক সম্পর্ক।

'আরে, মিস্ রুমা যে! এই সাত সকালে কি মনে করে এই অভাগাকে স্মরণ করলেন?'

হাসল না রুমা, এতক্ষণে আশিক লক্ষ্য করল ওর কপালে উদ্বেগের রেখা। কোন ভণিতা না করেই রুমা জানতে চাইল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে এক্ষুনি একটু মর্গে যেতে পারবেন? খুব দরকার!'

'এক্কেবারে মর্গে? বলেন কি! কে মরল?'

'সেটাই তো প্রশ্ন! তবে শুধু মৃতের পরিচয় নয়, আরও একটা রহস্য আছে এখানে,' সুন্দর করে প্লাক করা ভুরু দুটো নাচাল রুমা।

'জানি,' কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশিক, 'রহস্য না থাকলে কি আর আমাকে এমনি এমনি মনে পড়ে!'

'ঠাট্টা নয়, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস। বহুকষ্টে সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের ঠেকিয়ে রেখেছি, কতক্ষণ পারব জানি না। এক্ষুনি

আমাদের যাওয়া দরকার।'

গম্ভীর হলো আশিক, 'ঠিক আছে, আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি। যেতে যেতেই নাহয় সব শুনব।'

ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল রুমা। দ্রুত দু'একটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সেক্রেটারিকে, তারপর বেরিয়ে পড়ল আশিকও। রুমা ওর জীপের পিছনের সিটে বসে আছে। আশিক খাকী-পোশাক পরা ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। জীপ চলতে শুরু করলে পিছু ফিরল, 'তারপর, রহস্যটা কি বলুন তো?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে জানালার বাইরে রাস্তা দেখছে রুমা। দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'রহস্যটা বলে বোঝানো যাবে না। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করবেন না।'

'ব্যাপারটা কি, বলবেন তো?'

'দাঁড়ান, বলছি।' লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রুমা, 'ভীষণ ক্লান্ত আমি। গতকাল রাত থেকেই হাসপাতালে পড়ে আছি, এখন পর্যন্ত বাড়ি যাবার ফুরসত হয়নি।' এতক্ষণে আশিক লক্ষ্য করল রুমার শ্যামল সুশ্রী ত্বকে শুকনো ভাব, বেণী-বাঁধা চুল উষ্কখুষ্ক, চোখের কোলে হালকা কালি। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স রুমার, হাসিখুশি চমৎকার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এখন বাসি ফুলের মত নেতিয়ে পড়েছে যেন। একটু ইতস্তত করে বলতে শুরু করল রুমা, 'গতকাল সন্ধ্যায় ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরব, ঠিক তক্ষুনি হাসপাতাল থেকে ফোন এল। জরুরী তলব। সড়ক-দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত ভুতুড়ে এক রোগী রিসিভ করেছে ওরা।'

'ভুতুড়ে রোগী! সে আবার কি?' টিপ্পনী না কেটে পারল না আশিক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল রুমা, আস্তে করে বলল, 'ভুতুড়ে বললাম একারণে যে রোগীকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। একদম অদৃশ্য!'

'অদৃশ্য!' খাড়া হয়ে বসল আশিক, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। 'অদৃশ্য মানে?'

'অদৃশ্য মানে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাত বাড়ালে তাকে

স্পর্শ করা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নাকি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। কিন্তু আমার তা শোনার সৌভাগ্য হয়নি। আমি গিয়ে পৌছার আগেই লোকটা মারা গেছে। এখন এই অদৃশ্য মৃতদেহ নিয়ে আমি কি করি! হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিশেহারা হয়ে আমাকে খবর দিয়েছে। কিন্তু কি করা উচিত কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। সেজন্যেই আপনার ঘাড়ে সমস্যাটা পাচার করতে চাইছি।'

'মৃতদেহটা এখন কোথায়?' ঝড়ের বেগে আশিকের মাথায় চিন্তা চলছে।

'মর্গের ঠাণ্ডা-ঘরে। হাসপাতালের কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন গুজব রটছে। ওদিকে সকাল থেকে কৌতূহলী পাবলিকের ভীড়ে মেইন গেইট বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারদের ঠেকাতেই সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমরা করতে পারছি না। কি ঝামেলায় যে পড়েছি!'

'সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে বললেন, সেটা ঠিক কোথায় ঘটেছে বলতে পারেন?'

'গেনডারিয়ায়। রায়বাহাদুর রোডের উপর, লোকটা ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছিল। চীৎকার শুনে লোকজন...'

'রায়বাহাদুর রোড!' চমকে উঠল আশিক, 'কানাইপট্টির কাছাকাছি কি?'

'হ্যাঁ, ঠিক কানাইপট্টির মোড়ে। আপনি কিভাবে জানলেন?'

ম্লান হাসল আশিক, 'আপনার রহস্যের কিনারা করতে পারব কিনা জানি না, তবে সূত্র বোধহয় একটা ধরতে পেরেছি।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ রুমা, তারপর বলল, 'ঠিক এজন্যেই বিপদে আপনার কথা প্রথমেই মনে পড়ে, বুঝলেন!'

কিছু বলল না আশিক, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

হাসপাতালের গেটে জমজমাট ভীড়। বহুকষ্টে পুলিশী সহযোগিতায় জীপসহ ভেতরে ঢুকে গেল ওরা। ভেতরে থমথমে ভাব। কর্মচারীরা বারান্দায় জটলা করছে। চোখেমুখে ভয় আর সন্দেহের ছায়া। কেউ

ওদের সঙ্গে কথা বলল না। রুমা আশিককে সঙ্গে করে সোজা মর্গে চলে এল। দরজায় পাহারারত পুলিশ রুমাকে দেখে স্যালুট করল। দরজার বাইরে হল্লা করছে একদল লোক। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঠাণ্ডা-ঘরে চলে গেল ওরা। দেয়ালে আলমারির মত কয়েকসারি দেরাজ। একটা দেরাজের হ্যান্ডেল ধরে টান দিল রুমা, সড়সড় করে বেরিয়ে এল শূন্য স্টিলের লম্বা দেরাজ। আস্তে করে বলল, 'এই নিন, আপনার অদৃশ্য মৃতদেহ।'

'কোথায়?' বোকার মত বলে উঠল আশিক, 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'হাত দিন, তাহলেই বুঝবেন!'

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াল আশিক, দেরাজের ভেতরটা ছুঁতে গেল। পরমুহূর্তেই ইলেকট্রিক শক খাবার মত ঝট্ করে এক পা পিছিয়ে গেল। জানা থাকা সত্ত্বেও ভয়ের সহজাত প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারল না! আশ্চর্য! কিছু দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কিছু একটা আছে ওখানে! সাহস সঞ্চয় করে আবার হাত বাড়াল আশিক। হ্যাঁ, মানুষের মতই মনে হচ্ছে। শীতল খসখসে ত্বক, ছোট করে ছাঁটা চুল, খাড়া নাক। সন্দেহ নেই, কারও মুখে আর মাথায় হাত বুলাচ্ছে ও। ঢোক গিলে পাশ ফিরল আশিক, রুমার উদ্দেশ্যে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল রুমা, ভুরু নাচিয়ে বলল, 'এখন বলুন তো, কি করি!'

'দাঁড়ান, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়,' উত্তেজনায় বুকের খাঁচা ছেড়ে হার্টটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে শুরু করেছে আশিক। 'ইনভিসিব্‌ল্ ম্যান মুভিটা দেখেছিলেন?'

'ন্...নাহ্! মনে পড়ছে না। কেন?'

'এখানে পাউডার জাতীয় কিছু আছে? হাসপাতাল যখন, থাকতেই হবে! প্লিজ, একটু খুঁজে দেখবেন?'

'পাউডার? কি পাউডার? পাউডার দিয়ে কি করবেন?'

'দেরি করবেন না, প্লিজ!' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল আশিক, 'একটা ম্যাজিক দেখাব, দেখবেন!'

কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল রুমা, ফিরে এল এক টিন বোরিক

পাউডার নিয়ে। ওর হাত থেকে টিনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল আশিক। লাফিয়ে উঠল রুমা, 'বুঝতে পেরেছি!'

ততক্ষণে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে শুরু করেছে আশিক অদৃশ্য মানুষটার মাথার জায়গাটায়। ধীরে ধীরে আবছা একটা অবয়ব ফুটে উঠতে লাগল। পাউডারের গুঁড়ো বসে যাচ্ছে লোকটার চুলে-মুখে-গলায়। মনে হচ্ছে যেন পাউডারে চুবিয়ে তোলা হয়েছে মৃতদেহটাকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন চেহারাটা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আশিক। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাশেমের ছোট ভাইটাকে গতকাল ওর বাসায় দেখে এসেছে, হুবহু একই চেহারা এই লোকের। শুধু বয়সে একটু বড়। সেই একই সরু লম্বাটে মাথা, একটু বাঁকানো নাক, ছোট কপাল।

রুমার দিকে ফিরল আশিক, 'হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারব না, তবে মনে হয় এ ভূত না, সম্ভবত এর নাম হাশেম।'

'আপনি চিনলেন কেমন করে? আর অদৃশ্য হলো কি উপায়ে?'

'অদৃশ্য কেমন করে হলো, তা জানি না। তবে গতকাল পর্যন্ত সে দৃশ্যমানই ছিল, এটুকু জানি। তবে এই লোকই যে হাশেম, সেটা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। এর বাড়ি যাওয়া দরকার, একটা ছোট ভাই থাকে সেখানে। আচ্ছা, একটা পোলারয়েড ক্যামেরা জোগাড় করা যাবে? নাহলে আমার বাসা থেকে নিয়ে আসতে হবে। এর একটা ছবি তোলা দরকার।'

'দাঁড়ান, দেখছি,' দ্রুতপায়ে মর্গ থেকে বেরিয়ে গেল রুমা। ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যেই, হাতে পোলারয়েড ক্যামেরা, 'বেওয়ারিশ লাশের ছবি তুলে রাখার জন্যে এরা এখানে ক্যামেরা রাখে। ভাগ্য ভাল যে ক্যামেরাটা কাজ করছে।'

'ফাইন!' ঝটপট একটা ছবি তুলে ফেলল আশিক পাউডার মাখা কিম্ভূত মূর্তিটার। ক্যামেরার স্লট থেকে ছবিটা বের হয়ে এলে অধীর আগ্রহে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে শুকাচ্ছে ছবি, আর ভেসে উঠছে সাদা মুখটা। মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে চেহারাটা। 'নাহ্! খুব একটা খারাপ হয়নি। খুব বেশী ক্লান্ত না হলে চলুন একবার হাশেমের বাসায় যাই ছবিটা নিয়ে।'

'গুলি মারুন ক্লান্তির, এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না!'

পুলিশের জীপ নিয়ে ওরা যখন গেনডারিয়া পৌছল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। গাড়িতে যেতে যেতে হাজী সাহেবের কেসটার খুঁটিনাটি সব রুমাকে খুলে বলল আশিক।

গতকালের মত আজও দরজা খুলে দিল পঙ্গু ছেলেটা। উস্কখুস্ক চুল, রাতজাগা লালচে চোখ, ভীত-দিশেহারা চাউনি। পরনে হাতকাটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

'হাশেম কোথায়, বাসায় আছে?' জানতে চাইল আশিক।

'না, ভাইজানে রাইতে ফিরে নাই!'

রুমা আর আশিক দ্রুত দৃষ্টিবিনিময় করল। পকেট থেকে ছবিটা বের করে ছেলেটার চোখের সামনে তুলে ধরল আশিক, 'এটাই কি তোমার ভাই?'

হতভম্বের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ছবিটার দিকে কাশেম, 'ভাইজানে এইরকম সাদা হইল ক্যামনে?'

'তোমার ভাই গতকাল মারা গেছে।'

কাঁদতে শুরু করল কাশেম। হাউমাউ করে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যামনে মারা গেল? হায় হায়...'

'ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, সে সময় তোমার ভাই অদৃশ্য ছিল, কেউ ওকে দেখতে পায়নি। কি করে সে অদৃশ্য হলো, কিছু জানো?'

'কোনহানে একসিডেন হইছে? কখন?' কাঁদতে কাঁদতেই জানতে চাইল কাশেম।

'অ্যাকসিডেন্টের কথা জানতে চাইলে, অথচ অদৃশ্য হবার ব্যাপারটা শুনে তুমি একটুও অবাক হলে না? আশ্চর্য! তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানো?'

কোন কথা না বলে কাশেম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

'তোমাদের গলির বাইরে বড় রাস্তার মোড়ে হয়েছে অ্যাকসিডেন্ট। গতকাল দুপুরে। রাস্তার লোকজনই হাসপাতালে নিয়ে যায়, বেশিক্ষণ বেঁচে ছিল না তারপরে। অদৃশ্য একটা লোকের চিকিৎসা করা কি সহজ

কথা? লাশ এখনও মেডিকেলের মর্গে আছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলে খবর দেবার ব্যবস্থা করো। তুমি ছেলেমানুষ একা আর কত সামলাবে!' তারপরেও কাশেম কোন কথা বলল না দেখে আশিক একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'গতকাল এখানে একটা মেয়ে ছিল, সে কোথায়? মেয়েটা কে? তোমাদের সঙ্গে পরিচয় কিভাবে?'

'সে এখানে নাই এখন। আমি তারে চিনি না, ভাইজানে চিনে।' কান্না থেমে গেছে, সতর্ক চোখে দেখছে ওকে ছেলেটা, লক্ষ্য করল আশিক। অর্থপূর্ণ চোখে রুমার দিকে তাকাল সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রুমা, একটা কথাও বলেনি।

আরও পাঁচ মিনিট পর গলি থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'কি বুঝলেন?' মুখ খুলল রুমা।

'তেমন কিছুই না, তবে ছেলেটা সবই জানে। আমি অবশ্য আঁচ করতে পারছি রহস্যটা কি।'

'আমাকে বলবেন না?'

'এখন বললে বিশ্বাস করবেন না।'

'চোখের সামনে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি, আর আপনার কথা বিশ্বাস করব না?'

হাসল আশিক, চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'দাঁড়ান, আগে নিঃসন্দেহ হয়ে নিই, তারপর আপনাকে জানাব।'

গলির মুখে দাঁড়ানো জীপের দরজা খুলে উঠে বসল রুমা, আশিক উঠল না দেখে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল।

'আপনি বাড়ি চলে যান, মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমাকে এখন যেতে হবে ন্যাশনাল আর্কাইভে। একটু রিসার্চের কাজ আছে। এখনি না গেলে অফিস বন্ধ হবার আগে যথেষ্ট সময় পাব না।'

ড্যাশবোর্ড থেকে কলম আর নোটবুক বের করে কি যেন লিখল রুমা, তারপর কাগজটা বাড়িয়ে ধরল আশিকের দিকে, 'এই রইল আমার ফোন নাম্বার আর ঠিকানা। কিছু জানতে পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন কিন্তু।'

'তথাস্তু!'

'এখানে কি পুলিশ-পাহারার প্রয়োজন আছে? ছেলেটা পালাবে না

তো?'

'মনে হয় না। পঙ্গু ছেলে, একা একা চলাফেরা করাই তো ওর মুশকিল। যদি পাহারার দরকার হয়, আপনাকে জানাব।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল রুমা। একটা রিকশায় উঠে বসল আশিক, গভীর ভাবনায় মগ্ন।

বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায় পড়েছে রুমা, সামান্য কিছু মুখে দেবার মত সময় নষ্ট করতেও ইচ্ছে করেনি। মরার মত ঘুমাল কয়েক ঘণ্টা। রাত দশটার দিকে কাজের মেয়েটার ডাকে ঘুম ভাঙল, 'আফা, আপনের ফোন!'

'যা তো! বিরক্ত করিস্ না!' আলস্যে পাশ ফিরে আবার ঘুমানোর উদ্যোগ করল রুমা।

'খুব নাকি জরুরী!'

ডান চোখটা অর্ধেক খুলল, 'কে ফোন করেছে?'

'জানি না, পুরুষ লোক। অফিস থিক্যা মনে হয়।'

প্রায় লাফিয়ে খাট থেকে নামল রুমা, দৌড়ে এসে বারান্দায় রাখা টেলিফোন ধরল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আশিক। ঘুম ভাঙানোর জন্যে খুব দুঃখিত। কিন্তু বলে দিয়েছিলেন কিছু জানতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে যাতে জানাই। তাই ফোন করলাম।'

'কি জানতে পারলেন?' ধড়াস ধড়াস করে রুমার হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে বুকের খাঁচার ভেতর।

'টেলিফোনে বললে বুঝবেন, না। চলে আসুন না আমার অফিসে! আমি অফিস থেকেই বলছি।'

'এই এত রাত্তিরে যাব কেমন করে? থানায় ফোন করে গাড়ি আনাতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। তারচেয়ে আপনিই চলে আসুন না কেন আমার বাসায়, আপনার তো গাড়ি আছে!' আশিক রাজী হতে ভাল করে রাস্তা বাৎলে দিল রুমা।

না খেয়ে শুয়ে পড়েছিল বলে মা গজগজ করছিলেন। খিদে না থাকা সত্ত্বেও শুধু মাকে খুশি করার জন্যে নাকেমুখে দুটো ভাত খেয়ে

নিল রুমা। তারমধ্যেই আশিক পৌঁছে গেল। রান্নাঘরে চায়ের কথা বলে বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রুমা।

ঘরোয়া পরিবেশে কি নিরীহ আর মিষ্টি দেখাচ্ছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর রুমা মজুমদারকে! আধভেজা খোলা চুল, সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা ফোলা চোখ-মুখ, পরনে হালকা হলুদ প্রিন্টের সালোয়ার কামিজ।

হাতের বড় হলুদ খামটা শূন্যে নাচাল আশিক, 'সোনার খনি পেয়ে গেছি, বুঝলেন?' খাম থেকে একরাশ ছবি বের করে সেন্টার টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিল সে। কমপিউটার মনিটর থেকে প্রিন্ট করা ছবি।

ছবিগুলো দেখে কিছু বুঝতে পারল না রুমা। ঐতিহাসিক ছবি বেশীরভাগই। জওয়াহের লাল নেহরুকে চিনতে পারল একটা ছবিতে, কোন সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। ইয়াহিয়া খান আর ভগবান রজনীশকে দুটো ছবিতে চিনতে পারল। প্রশ্নবোধক চোখে আশিকের দিকে তাকাল রুমা।

একটা ছবিতে টোকা দিল আশিক, 'ইয়াহিয়া খানের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটাকে দেখেছেন?'

তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল রুমা। সুন্দরী এক তরুণী, ভাষণরত ইয়াহিয়া খানের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পুরো শরীর দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে কালো কি একটা পোশাক পরে আছে। পানপাতার মত নিখুঁত মুখ, মাঝখানে সিঁথি করা লম্বা কালো চুল। হাসল রুমা, 'শুনেছি ইয়াহিয়া খান রমণীমোহন লোক ছিলেন। কোন মেয়ে বান্ধবী? কে মেয়েটা?'

'এই মেয়েকেই আমি গতকাল হাশেমের বাসায় দেখেছি!' স্থির চোখে চেয়ে আছে আশিক।

'কি যা তা বলছেন? এই মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তো এখন বুড়ী হয়ে যাবার কথা। যাকে দেখেছিলেন সে তো কমবয়েসী মেয়ে!'

বিনাবাক্যব্যয়ে আর একটা ছবি বাড়িয়ে ধরল আশিক। পুরনো যুগের ছবি। গ্রুপ ছবি। পরিবার-পরিজন চারপাশে নিয়ে কারুকাজ করা কালো কাঠের চেয়ারে বসে আছেন মাঝবয়েসী রাশভারী এক

লোক। পরনে সুট, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে সোনার ঘড়ির চেন। মাঝখানে সিঁথি করা কালো কোঁকড়া চুল। চোখে চশমা। ভদ্রলোকের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে আগের ছবির ওই মেয়েটা! আশ্চর্য! কোন ভুল নেই, এই একই মেয়ে! একই চোখ, একই চুল, একই পোশাক! ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত চেয়ে রইল রুমা।

'ভদ্রলোককে বোধহয় চিনতে পারেননি। রাজনারায়ণ দত্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাবা। নামকরা ধনী লোক ছিলেন এককালে। বালক মাইকেল দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের হাতল ধরে।'

'তা কি করে হয়! ইয়াহিয়া খান তো সেদিনের লোক আর রাজনারায়ণ দত্ত—না হলেও এক-দেড়শো বছর আগের কথা! একই মেয়ে কিভাবে হয়?'

'যতগুলো ছবি দেখছেন, তার সবগুলোতেই মেয়েটা উপস্থিত। সবগুলো ছবিতেই তাকে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতাশালী বা ধনী কোন লোকের সঙ্গে। এরা সবাই প্রভূত ক্ষমতা বা ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন একসময়, আবার সবকিছু হারিয়েও ফেলেছিলেন করুণ ভাবে।'

'ছবিগুলো কোথায় পেলেন?'

'ন্যাশনাল আর্কাইভে। হাজী সাহেবের অবস্থা আর হাশেমের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনা দুটো যখন একসঙ্গে মিলিয়ে চিন্তা করলাম, একটা সন্দেহ হলো। হাশেম রেগে গিয়ে বলেছিল হাজী সাহেবের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়—আর হাজী সাহেবের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সে নিজেও কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল! এদিকে নুরুল আফসারের সঙ্গে এই মেয়ের পরিচয় ছিল, একসঙ্গে তোলা ছবি পেয়েছি খালি বাসার জঞ্জালের মধ্যে। অথচ ছবির ওই মেয়েটাকে তার আগের দিনই দেখে এসেছি হাশেমের বাসায়, তার বয়স কিন্তু একটুও বাড়েনি! জানেন তো, এ বিষয়ে আমার একটু পড়াশুনা আছে। সন্দেহ হলো, মেয়েটা মানুষ নয়। ওয়েস্টার্ন মিথলজীতে যাকে "জিনী" বলে, আর প্রাচ্যে যাকে "দেবী" নামে ডাকা হয়—এ হলো সে-ই।'

'যাহ্!' জোর করে হাসতে চেষ্টা করল রুমা। 'কি যে বলেন! জিন-পরী এসব শুধু গল্পেই থাকে।'

'হাশেমের অদৃশ্য শরীর নিজের হাতে স্পর্শ করেছেন, করেননি? হাজী সাহেবের কি হয়েছে তাও শুনেছেন।' ছবিগুলো ওর দিকে আর একটু ঠেলে দিল, 'এগুলো দেখার পরেও কি সন্দেহ আছে?'

হাসি মুছে গেছে রুমার মুখ থেকে।

'সন্দেহ হওয়াতেই ন্যাশনাল আর্কাইভে গেলাম। মাইক্রোফিল্মে পুরনো খবরের কাগজে ছাপা ছবিগুলো ঘাঁটতে শুরু করলাম। বেশিক্ষণ লাগল না, ভগবান রজনীশের পাশে বসা মেয়েটাকে চিনে ফেললাম। জানেন তো, সত্তরের দশক থেকে রজনীশ কি রকম সাংঘাতিক ক্ষমতা আর সম্পদের অধিকারী হয়েছিল! তারপর হঠাৎ করেই আবার সবকিছু হারিয়ে যায়। দেখতে দেখতে আরও ছ'সাতটা ছবি খুঁজে পেলাম। বিখ্যাত সব লোকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে।'

'শুধু বিখ্যাত লোকেদের সঙ্গেই কেন দেখা যাচ্ছে ওকে? তাছাড়া হাশেম তো নেহাত সাধারণ একটা লোক, ওর সঙ্গে...'

'সাধারণ লোকেরাই ওর সংস্পর্শে এসে বিখ্যাত হয়ে যায়। আমার পড়াশুনা যতদূর বলে, এই "দেবী" বা "জিনী" মানুষের ইচ্ছাপূরণ করে। যাকে বলে "বর" দেওয়া। মনে আছে "গুপী গাইন বাঘা বাইনের" সেই গানটা?' সুর করে গান ধরল আশিক, 'দিলেন ভূতের রাজা তিন বর তাজা তাজা...'

'ধ্যাৎ! সবসময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার।' আনমনে দাঁতে নখ খুঁটছে রুমা, 'এখন কি করা যায়, বলুন তো? ভূতের সঙ্গে পুলিশের আবার কিছুতেই বনে না!'

'আদৌ কিছু করতে পারব কিনা জানি না, তবে এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ছি না,' ছবিগুলো খামের ভেতরে চালান দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আশিক।

পাঁচ

একা একা বিছানায় পড়ে কাঁদল কাশেম। শোকে-দুঃখে ঝাঁঝরা হয়ে

যাচ্ছে ওর ভেতরটা। সেই সঙ্গে জেঁকে ধরছে অনিশ্চয়তা আর ভয়। ভাই ছাড়া এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে ওর মত পঙ্গু একটা ছেলের বেঁচে থাকাই যে দায়! ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই যে খোলা রইল না!

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল পুরনো ঢাকার অলিতে গলিতে। কমে এল রাস্তার কোলাহল। সন্ধেবাতি জ্বলল ঘরে ঘরে। চোখ মুছে উঠে বসল কাশেম। ঘষটে ঘষটে মেঝেতে নামল। সুইচে লম্বা দড়ি বাঁধা আছে, সেটা টেনে অল্প পাওয়ারের বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ভাল করে দেখল ঘরের একমাত্র জানালাটা বন্ধ আছে কিনা।

নিচু হয়ে ঝুঁকে চৌকির তলায় উঁকি দিল কাশেম। আবছা আঁধারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গুটিয়ে রাখা কার্পেটটা। বহু কষ্টে টানতে টানতে চৌকির তলা থেকে বাইরে এনে ফেলল ওটাকে কাশেম। একপাশ ধরে টান দিল।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল সুন্দরী মেয়েটা কার্পেটের ঠিক মাঝখানে। ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'কি হলো, ঠিক করলে কি চাও?'

'ওই কার্পেটের ভিতর নিঃশ্বাস লন ক্যামনে, কন্ তো?'

'বাজে কথা রাখো, কি চাও সেটা বলো।'

'আরে রাখেন-রাখেন। আমারে একটু ভাবতে দ্যান। ভাইজানের মত ভুল য্যান্ না হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাশেম।

'তাহলে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি তো পঙ্গু, এ ব্যাপারে কিছু করো না কেন?'

খুশি হয়ে উঠল কাশেম, 'ও, তাই তো! একটা হুইল চেয়ার হইলে মন্দ হয় না!'

হতাশায় মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, আর কোন কথা বলল না।

একটু চিন্তা করে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কাশেম, 'পাইছি! চেয়ার-টেয়ার না, আমার ভাইরে তুমি ফিরাইয়া দাও। ভাইজান থাকলে আমার সব হইব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'ভাল করে চিন্তা করে দেখো, কাশেম।'

'আর চিন্তা-ভাবনা করন লাগব না। ভাইজান ছাড়া আমার দুনিয়া অন্ধকার। আমি আমার ভাইরে ফেরত চাই।'

'ঠিক আছে, তাই হবে!' ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তরুণী, ক্লান্ত

ভঙ্গিতে দু'চোখ বুজল। ঝিকমিক করে জ্বলে উঠল ওর ডান চোখের নিচের বিন্দুটা।

সকাল ন'টা বেজে দশ মিনিট। অন্যান্য দিনের মতই শুরু হলো নতুন একটা দিন। তারপরেও দিনটা যে একটু অন্যরকম, তা বোঝাই যায়। সারা শহরময় গুজবের ছড়াছড়ি। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। খবরের কাগজে অদৃশ্য-মানব সংক্রান্ত সত্যি-মিথ্যে রিপোর্টের ছড়াছড়ি। তাতে উত্তেজনা বাড়ছে বই কমছে না।

ঢাকা মেডিকেলের চারপাশে কড়া প্রহরা। সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারী উঁচু মহলের কর্মকর্তারা সকাল না হতেই পৌঁছে গিয়েছেন সুপারিন্টেনডেন্টের অফিসে। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং দু'জন সচিব ছাড়াও দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীও আছেন এ দলে।

রুমা মজুমদারকে খুব সতেজ আর স্মার্ট দেখাচ্ছে কড়কড়ে ইউনিফর্মে। ছোট্ট দলটাকে পথ দেখিয়ে মর্গের ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে চলেছে। আই.জি. সাহেবও ওর সঙ্গে আছেন। দ্রুতপায়ে নির্দিষ্ট ড্রয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুমা, নাটকীয় ভঙ্গিতে পিছু ফিরে সবার দিকে চাইল। 'এই যে, দেখুন!' টান দিয়ে ড্রয়ারটা বের করে নিয়ে এল রুমা।

'কই, কোথায়?' অস্ফুটে জানতে চাইলেন আই.জি. সাহেব।

অবাক হয়ে ড্রয়ারের ভেতরটা দেখছে রুমা। গেল কোথায় মৃতদেহটা? পাউডার ছড়ানো চেহারাটা তো দিব্যি দেখা যাওয়ার কথা! অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে ড্রয়ারের ভেতরটা ছুঁলো। আরে! কিচ্ছু নেই! ড্রয়ারের ভেতর মৃতদেহটা নেই!

'কি হলো?' জানতে চাইলেন আই.জি.।

'কি জানি···সার!' আমতা আমতা করছে রুমা, 'এখানেই ছিল, এখন নেই!'

তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল সবার মধ্যে।

ওদিকে সকাল হয়েছে গেনডারিয়া অঞ্চলেও। গালে হাত দিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে বসে আছে কাশেম। চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসে আছে হাশেম, শরীরের এখানে সেখানে জখমের রক্ত শুকিয়ে আছে। সাদা পাউডার মাখা চেহারাটা কিম্ভূত দেখাচ্ছে। নড়াচড়া করছে না, শূন্য

দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেঝের দিকে। পাশে একটা প্লেটে দুটো আটার রুটি আর আলুভাজি, নাস্তা করে দিয়েছিল কাশেম। কিন্তু স্পর্শ করেনি সে। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছে, চারপাশের কোন কিছুর প্রতিই আগ্রহ নেই। কয়েকটা মাছি ভনভন করছে ওর রক্তমাখা ঘায়ের আশেপাশে, সেগুলোকে পর্যন্ত তাড়াচ্ছে না। ছোট্ট ঘরটাতে কেমন যেন চিমসে গন্ধ। দরজা-জানালা শক্ত করে আটকানো।

'কি হইছে ভাইয়ের? কথা কয় না ক্যান?' অধৈর্য হয়ে ঘরে উপস্থিত তৃতীয়জনের দিকে চাইল কাশেম।

তরুণী আগের মতই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে হাতের রঙ করা নখগুলো দেখছিল। প্রশ্ন শুনে বিরক্তির ভঙ্গিতে চোখ তুলে চাইল, 'তুমি ওকে ফেরত চেয়েছিলে, পেয়েছ তো!'

'কিন্তু এইটা কি হইল? ভাইজানে তো নড়ে না চড়ে না কথাও কয় না! আবার দুর্গন্ধ ছড়াইতাছে!'

'ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে, ও কি আর সুস্থ থাকবে?'

'কিন্তু আমি তো আমার ভাইরে আগের মত সুস্থ চাইছিলাম! এই ভাইরে নিয়া আমি এখন কি করুম?'

'তুমি তা বলে দাওনি। শুধু বলেছিলে ভাইকে ফেরত চাও। আগের মত সুস্থ অবস্থায় চাইলে আমাকে সেটা বলে দেয়া উচিত ছিল। তোমাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি আমি, তার বাইরে যেতে পারি না।'

'কি জ্বালা! কিন্তু ভাইজানে কথাবার্তা না কইলে ক্যামনে হইব? আপনে এখন ওরে কথা বলার ক্ষ্যামতা দিয়া দ্যান।'

'চিন্তা ভাবনা করে দেখো, কাশেম। আর মাত্র দুটো ইচ্ছাই পূরণ করা যাবে,' তরুণীর পটলচেরা চোখে তিরস্কার।

'চিন্তা কইরাই কইতাছি।' গোঁয়ারের মত বলল কাশেম, 'আমি চাই আমার ভাই কথা কইতে পারুক, মুখে বুলি ফুটুক।'

'ঠিক আছে, তবে তাই হোক!' জ্বলে উঠল ওর ডান চোখের নিচের বিন্দুটা।

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শুরু করল হাশেম। যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে! পাড়া মাথায় ওঠার উপক্রম হলো। কানে হাত চাপা দিল

কাশেম, এ আবার কি উপদ্রব!

আশিকের অফিসে ওর সামনের চেয়ারে বসে আছে রুমা। আনমনা দৃষ্টি, গালে হাত। 'কি রকম অপদস্থ হলাম, বলুন তো! হুঁঃ! অদৃশ্য-মানুষ! এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কি ভাবলেন আমাকে ওনারা?'

'কিন্তু আপনি তো জানেন, ব্যাপারটা সত্যি,' সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল আশিক।

'কিন্তু তাহলে মৃতদেহটা গেল কোথায়? এত কড়া পাহারার মধ্যে চুরি যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'চুরি যায়নি। তবে এ ব্যাপারে আমার একটা থিওরী আছে।'

'থিওরী!' আগ্রহী হলো রুমা।

'আমার মনে হয় এই অদৃশ্য মৃতদেহ আবার অদৃশ্য হবার পেছনে ইচ্ছাপূরণের একটা ব্যাপার আছে।'

'ইচ্ছাপূরণ!'

'হ্যাঁ। কেউ হয়তো ওকে ফেরত চেয়েছে। এমন কেউ, যে হাশেমকে খুব ভালবাসে।'

'ওর ছোট ভাইটা!' লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুমা।

'ভাইজানে চিল্লায় ক্যান? মাথা ধইরা গেল তো!' অস্থির হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল কাশেম।

'চ্যাঁচাবেই তো! আহত হয়েছে, যন্ত্রণা তো হবেই।'

ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে উঠল হাশেম, 'কি করছস্ তুই, কাশেম? তুই আমার এই হাল করছস্?'

'মইরা তো গেছিলা, সেখান থেইকা বাঁচাইয়া আনছি, আর এখন তুমি আমারে গাইল পারো!'

'ঠিক কইরা ক, কি করছস্ তুই?'

'তোমারে বাঁচাইয়া তোলা আর কথা কওয়ানোর লাইগ্যা দুইটা ইচ্ছা খরচ কইরা ফালাইছি।'

'এইটা কি করলি তুই!' কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল হাশেম, দু'হাত জড়ো করে বুকটা চেপে ধরেছে। 'চাইয়া দ্যাখ্ আমার দিকে। হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা চুরমার···ভর্তা হইয়া গ্যাছে শরীরটা···যন্ত্রণায় মইরা যাওনের জোগাড়! কেন্ ফিরাইয়া আনলি···

উহ্! কি শীত করতাছে আমার!' বিলম্বিত লয়ে গোঙাতে শুরু করল হাশেম, 'কি শীত রে, বাবা! উ-হু-হু-হু…'

রাগী চোখে মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকাল কাশেম, 'আমি কি এইটা চাইছিলাম? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! শুধু শুধু দুইটা ইচ্ছা নষ্ট হইল!'

ঘাড় নাচাল সুন্দরী, 'কথা বললে তো কানে তোলো না। আমি তো বার বার সাবধান করেছি!'

'হইছে হইছে!' অধৈর্যের ভঙ্গিতে হাত নাচাল কাশেম। 'ভাইয়ের পিছনে আর সময় নষ্ট করুম না। ভাল শিক্ষাই হইছে। একটা ইচ্ছা তো এখনও বাকি আছে। ভাইবা-চিন্তা ঠিক করতে হইব কি চাওয়া যায়। এইবার নিজের জন্যে কিছু চামু…শুধু নিজের জন্যে…' বিড়বিড় করতে করতে দাঁতে নখ খুঁটছে কাশেম, 'কয়েক লাখ টাকা…না, টাকা ছাপানোর মেশিন…মণিমুক্তা-হীরা-জহরত…কত কিছুই না আছে! হুঁহ্! অদৃশ্য হওয়া…এইটা একটা কিছু হইল! আমারে কয় হাবা…আসলে ভাইজানেই হইল বাজারের সেরা হাবা!'

ওরা কেউ খেয়াল করেনি, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কখন যেন হাশেম উঠে গিয়ে চুলার গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আগুনের আঁচে শরীরটা গরম করার ইচ্ছে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে বাক্স থেকে ম্যাচের কাঠি বের করছে একের পর এক, কিন্তু কাঁপুনির চোটে কাঠিগুলো ফসকে পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে। অনেক কষ্টে একটা কাঠি প্রাণপণে চেপে ধরল দু'আঙুলে, ঘষল বাক্সের গায়ে। না, হলো না। জ্বলল না কাঠিটা। আবার সমস্ত শক্তি এক করে কাঠিটা খাড়া করে ধরল কাশেম।

নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকল মেয়েটা, 'কি ব্যাপার…কিসের যেন গন্ধ! গ্যাসের গন্ধ না?'

ঠিক সেই মুহূর্তে গলির মাথায় রুমার জীপ এসে দাঁড়াল, লাফিয়ে নামল আশিক আর রুমা। দ্রুতপায়ে রওনা হলো হাশেমের খুপরীর দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে হলো না, প্রচণ্ড শব্দে পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল! বিরাট একটা আগুনের বল লাফিয়ে বেরিয়ে এল হাশেমের খুপরীর দরজা-জানালা ভেঙে! এক লাফে লাল ট্রাকটার আড়ালে আশ্রয় নিল রুমা আর আশিক। আগুনের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে

ছিটকে বেরিয়ে আসছে টুকরো কাঠ-ইঁটের টুকরো। যেন আকাশ থেকেই ধপাস করে ঠিক ওদের সামনে এসে পড়ল গোল করে মোড়া একটা কার্পেট! বিস্ফোরণের ধাক্কা কমে এলে ওটার দিকে হাত বাড়াল আশিক।

ঘণ্টা তিনেক পরের কথা। দুপুর গড়িয়ে গেছে। নিজের অফিসে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আশিক, দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করা। মনোযোগ দিয়ে দেখছে সামনে বসা সুন্দরী মেয়েটাকে। চেয়ারটা একটু পিছনে টেনে নিয়ে বসেছে মেয়েটা, সপ্রতিভ স্মার্ট ভঙ্গি। সেই একই কালো পোশাক পরনে, ডান চোখের নিচে হীরের মত জ্বলছে একটা ছোট্ট বিন্দু।

'আপনার নাম?' নিরবতা ভাঙল আশিক।

'অনেক বছর ধরে আমার কোন নাম নেই,' হালকা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কি মেয়েটা?

'তাহলে তো একটা নাম দিতে হয়,' কৌতুকের সুরে বলল আশিক। ' "জিনি" নামটা কেমন? অথবা "দেবী"?'

হাসল সে, 'আমার নাম ইরাম। বহু বছর কেউ আমাকে নাম ধরে ডাকেনি। ভুলতেই বসেছি নামটা।'

দরজায় নক্ করে রুমা ঢুকল। ইরামের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আশিকের উদ্দেশ্যে বলল, 'দমকল বাহিনীর লোকেরা পোড়া ঘরটা থেকে দুটো মৃতদেহ বের করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল আশিক। 'হাশেম আর কাশেম, দু'ভাই।'

'এখন অবশ্য হাশেমের মৃতদেহ অদৃশ্য অবস্থায় নেই, বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দিব্যি সাধারণ মানুষের মৃতদেহের মতই। তবে আমার প্রশ্ন,' বলতে বলতে সরাসরি ইরামের চোখে চোখ রাখল রুমা, 'হাসপাতালের মর্গ থেকে হাশেমের মৃতদেহটা তার বাড়িতে গেল কেমন করে?'

'আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন না,' মৃদু হেসে ইঙ্গিতে আশিককে দেখাল ইরাম, 'ওঁর ধারণা সবকিছুই উনি জানেন।'

'হ্যাঁ, ওঁর ধারণা আপনি আরব্য উপন্যাসের কোন চরিত্র। ডাইনী বা পরী কিছু একটা!' রুমার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'তাহলে তো আর জানতে কিছু বাকি নেই!' পিছনে মাথা হেলিয়ে জোরে হেসে ফেলল ইরাম।

ওর হাসিটা উপভোগ করল আশিক, কি নিষ্পাপ আর সাধারণ দেখাচ্ছে ওকে এই মুহূর্তে! হাসি থামলে ওর চোখে চোখ রাখল আশিক, আস্তে আস্তে বলল, 'শুধু বুঝে উঠতে পারছি না আপনি শুভ কি অশুভ–মানে, ভাল না খারাপ "জিনি"। যারাই আপনার সংস্পর্শে এসেছে, তাদের সবার কপালেই নেমে এসেছে দুনিয়ার দুর্ভোগ। সেকারণেই মনে হয় আপনি অশুভ।'

রেগে উঠল ইরাম, 'ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন! কি অপূর্ব বুদ্ধি!'

'তাহলে নিশ্চয়ই আপনি অভিশপ্ত! কেউ অভিশাপ দিয়েছে...'

ধৈর্য হারিয়ে উঠে দাঁড়াল ইরাম, 'আপনারা মানুষরা এত বোকা, কি আর বলব! প্রত্যেকটা লোক...যত জনের সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা হয়েছে, প্রত্যেকটা লোকই বোকার চূড়ামণি! কি আর বলব! সব সময় সেই একই জিনিস চাই ওদের, হয় টাকা নয় ক্ষমতা...সুন্দরী নারী, দামী গাড়ি–আসল কাজের জিনিস কেউ চায় না! শুধু ভুল জিনিস চাই ওদের!' ছোট্ট ঘরটার মধ্যে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগল ইরাম অস্থির হয়ে।

'ভুল জিনিস!'

'হ্যাঁ, ভুল জিনিস। এই পাঁচশো বছরেও মানুষ একটু বদলায়নি, বুঝলেন! যেমন বোকা ছিল তেমনি বোকাই আছে!'

'পাঁচশো বছর?' না বলে পারল না রুমা। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন গত পাঁচশো বছর ধরে মানব সমাজের উত্থানপতন দেখেছেন আপনি নিজের চোখে?'

'আরে, আমি তো একসময় মানুষই ছিলাম! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজস্থানে আমার জন্ম। এখন সে জায়গাটা ভারতবর্ষের মধ্যে। অজপাড়া গাঁয়ের এক সাধারণ চাষী পরিবারের মেয়ে আমি। আমার যখন উনিশ বছর বয়েস, একদল ইরানী জীপসী এল গাঁয়ে। তাদেরই একজন, খুনখুনে এক বুড়ী হাতে বোনা কার্পেট বিক্রি করতে এল আমাদের বাড়িতে। দেখতে দেখতে না জেনেই একটা কার্পেট খুলে ফেললাম। সেই কার্পেটে ছিল এক ইফ্রিট।'

'ইফ্রিট! সে আবার কি?' অনেক চেষ্টা করেও হাসি চেপে রাখতে

পারছে না রুমা। পুরো ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

পাত্তা দিল না ইরাম, গম্ভীর মুখেই উত্তর দিল, 'ইফ্রিট হলো খুব শক্তিশালী "জিনী", বলা যেতে পারে সব জিনীদের মধ্যে ওদেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা। তো ইফ্রিট আমাকে বলল তিনটে বর চাইতে। যা চাইব সবই নাকি পাব। প্রথমেই চাইলাম সুস্থসবল তাগড়া একটা বলদ!'

'বলদ!' অবাক হয়ে গেল রুমা, এখন আর হাসছে না।

'আরে, সিচুয়েশানটা দেখবেন তো,' হাত ঝেড়ে মাছি তাড়াবার মত একটা ভঙ্গি করল ইরাম, 'গরিব চাষীবাড়ির মেয়ে, চাষ করার উপযোগী ভাল একটা বলদই ছিল আমার কাছে তখন সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। তো নিমেষেই বলদ হাজির! আমার আনন্দ দেখে কে! এরপর আমি চাইলাম শস্যভরা একটা গোলা, পেয়ে গেলাম তাও। ততক্ষণে বুদ্ধি খুলতে শুরু করেছে। বুঝলাম শেষ বরটা ভেবেচিন্তে চাওয়া উচিত। বুঝলেন, সারা রাত ধরে ভাবলাম,' বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল ইরাম। উদাস চোখে জানালার বাইরে গাড়িঘোড়া দেখতে লাগল, যেন ভুলেই গেছে ওদের উপস্থিতি।

তাড়া দিল আশিক, 'তারপর, সকালে উঠে কি চাইলেন? তৃতীয় এবং শেষ বর?'

জানালা থেকে চোখ সরিয়ে ম্লান হাসল ইরাম, বিজাতীয় এক ভাষায় কি যেন বলল।

'কি বললেন?'

'ওটা আমার মাতৃভাষা। ইফ্রিটের কাছে আমার শেষ দাবি ছিল অমরত্ব আর অনেক ক্ষমতা। পৃথিবীর সব ক্ষমতা হাতের মুঠোয় চেয়েছিলাম আমি, আর সেই ক্ষমতা উপভোগ করার জন্যে চেয়েছিলাম অমর হতে।'

'তখন আপনি নিজেই "জিনী" হয়ে গেলেন!' অস্ফুটে বলে উঠল আশিক।

তর্জনী দিয়ে চোখের নিচের স্বচ্ছ বিন্দুটা ছুঁলো ইরাম, 'এই যে দেখছেন, এটা হলো "জিনী"-র চিহ্ন। চিরদিনের মত এটা আমার শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে। জানেন তো, জেলখানায় কয়েদীরা শরীরে উল্কি পরে, এটা আমার উল্কি।' শেষের দিকে ইরামের কণ্ঠস্বর

ভিজে এল, 'কি বোকা ছিলাম আমি, ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারিনি!'

রুমার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, অবাক চোখে একবার ইরামের দিকে আরেকবার আশিককে দেখছে। কেউ কোন কথা বলল না।

নিরবতা ভাঙল ইরামই, 'আমাকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন?'

রুমাই উত্তর দিল, 'না। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করানো যাবে না। কোন ঘটনার সঙ্গেই আপনার যোগাযোগ প্রমাণ করা যাবে না। তাছাড়া লোক হাসানোর ইচ্ছে আমার আর নেই। এমনিতেই যথেষ্ট অপদস্থ হয়েছি আজ। আপনি যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন। আপনি এখন থেকে স্বাধীন।'

'না,' আড়চোখে আশিকের দিকে তাকাল ইরাম, 'আমি এখনও স্বাধীন নই। এই ভদ্রলোক কার্পেট খুলে আমাকে বের করেছেন।'

'তার মানে আমার তিনটে ইচ্ছে পূরণ করতে হবে আপনাকে!' খুশিতে লাফিয়ে উঠল আশিক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রুমা, তারপর কাউকে কিছু না বলেই চলে গেল।

'আপনার বান্ধবী আমাকে পছন্দ করতে পারছেন না,' মৃদু অভিযোগের মত শোনাল ইরামের মন্তব্য।

'আসলে তা না,' বুঝিয়ে বলল আশিক, 'ও ঠিক আপনাকে বুঝে উঠতে পারছে না, সেজন্যে অস্থির হয়ে আছে। ওর দোষ দেব কি, আমি নিজেও আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে তো সমস্যা মিটেই গেল,' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ইরাম, চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক, 'বর না চাইলে আমাকে নিষেধ করে দিন, এক মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে যাব। ব্যস্, ঝামেলা শেষ!'

কোন কথা বলল না আশিক, একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইরামের দিকে।

জোরে হেসে উঠল ইরাম, 'জানতাম: এত বড় লোভ ত্যাগ করতে পারবেন না!' ধীরে ধীরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখতে দেখতে বলল, 'তো বলুন, কি চাই আপনার? তিনটে চান্স কিন্তু!'

আশিক ঢোক গিলল নার্ভাস ভঙ্গিতে, 'আপনি হলে কি চাইতেন,

বলুন তো?'

'আমি আপনি নই, বলে কোন লাভ নেই,' বাঁ হাতে গালের পাশ থেকে একগোছা চুল পিছনে সরিয়ে দিল ইরাম। একমনে দেখছে রাস্তায় শহরের জনজীবন।

'না না, বলুন না, আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'

ঘাড় কাৎ করে মোহময়ী ভঙ্গিতে ওর দিকে চাইল ইরাম, সুন্দর করে হাসল। 'সত্যি জানতে চান?' একটু যেন ভাবল, তারপর বলল, 'প্রথমেই চাইতাম "ইচ্ছে" কথাটা সব ডিকশনারি থেকে মুছে দিতে। পাঁচশো বছর ধরে শুনতে শুনতে তিতি বিরক্ত হয়ে গেছি।' ধীরে ধীরে আবার জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ইরাম, দৃষ্টি মেলে দিল আকাশের গায়ে, 'তারপর চাইতাম সাধারণ মানুষের মত একটা জীবন। জানেন, চোখ বুজলেই আমি স্বপ্ন দেখি উঁচু একটা সবুজ পাহাড়, তার গায়ে ছোট্ট একটা জনপদ। পাইন বনের ছায়ায় ছবির মত সুন্দর একটা কাঠের বাড়ি। তার সামনের রেলিঙঘেরা বারান্দায় বসে আছি আমি, হাতে ধোঁয়া-উঠা চায়ের কাপ। জানেন, আমি আবার মানুষ হয়ে যেতে চাইতাম।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইরাম, তারপর আশিকের দিকে ফিরে তাকাল, দেখলেন তো, বলেছিলাম না, আমি আপনি নই! আমার ইচ্ছে একদম আলাদা! তো, ঠিক করুন এখন, কি চাই।'

'আমি কিন্তু ভাবছি একটা ব্যাপার নিয়ে। আপনি বলেছিলেন সবাই ভুল জিনিস চায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই তো! সব্বাই! কোন ফারাক নেই।'

'আমার কি মনে হয় জানেন, সবাই স্বার্থপরের মত শুধু নিজের জন্যেই চায়, সেখানেই ভুলটা হয়। তাই না?'

'হয়তো,' আগ্রহী শ্রোতার মত শুনছে ইরাম।

'তার মানে, ট্রিকটা হলো, এমন কিছু চাইতে হবে যাতে সমাজের সকলেরই উপকার হয়, শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি নয়। কি বলেন?'

'নাহ্! সব মানুষ তাহলে বোকার হদ্দ নয়, আপনার কথা শুনে কিছুটা আশা হচ্ছে।'

'তাহলে আমি জানি, আমি কি চাই।'

'আদেশ করুন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল ইরাম, ঠোঁটে

হাসি।

'আমি চাই বিশ্বশান্তি!'

অবাক হয়ে চাইল ইরাম, 'কি! বিশ্বশান্তি!'

'কেন, এতে অসুবিধা কি? আপনি পারবেন না?'

হতাশায় ম্লান দেখাল ইরামকে, 'না পারার কি আছে? ক্ষমতা যখন আছে, সবই পারি। তো ঠিক আছে, তাই হোক। বিশ্বশান্তি!' ঝিকমিক করে উঠল ওর চোখের নিচের বিন্দুটা।

'কই, কিছু তো হলো না। ঠাট্টা করেছেন, না?' একটু আশাহত হলো আশিক, প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও।

'ঠাট্টা করব কেন? আপনার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। প্রাচীন পৃথিবীর সেই জীবন ফিরে এসেছে আবার। নিশ্চিন্তে বিচরণ করে বেড়াবে এবার জন্তুজানোয়ারের দল।'

হঠাৎ চমকে উঠল আশিক। এতক্ষণে খেয়াল করল রাস্তাঘাটের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, চারপাশে পিনপতন নিরবতা। এক লাফে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। অবাক কাণ্ড! বাইরে কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না! রাজপথে গাড়ি, রিকশা, বাস, ট্রাক সব চলতে চলতে হঠাৎ করে কখন যেন থমকে দাঁড়িয়েছে একসঙ্গে—সবই আছে, শুধু ছবির মত স্থির। শুধু মানুষজন সব কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে!

এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল আশিক। আশ্চর্য! ফুটপাথে বইয়ের দোকান, তরকারির ঝাঁকা সব পড়ে আছে, শুধু নেই দোকানদার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ট্র্যাফিক লাইটটা সবুজ হয়ে জ্বলে আছে, হলুদ আর হচ্ছে না। থমকে গেছে সময়!

রাস্তায় দৌড়াতে শুরু করল আশিক, চীৎকার করে ডাকল, 'এই যে! কেউ কোথাও আছেন? হ্যালো!'

কেউ সাড়া দিল না! সারি সারি বাড়ি আর রাস্তার যানবাহন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল নির্বিকার!

ভীষণ ভয় পেল আশিক। চেঁচিয়ে ডাকল, 'জিনী! না, ইরাম... কোথায় আপনি!'

'এই তো, এখানেই আছি!'

চমকে পিছু ফিরল আশিক। ফুটপাথে একটা লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইরাম, ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'কি ব্যাপার বলুন তো? এটা আপনি কি করলেন?' চেষ্টা করেও রাগ চেপে রাখতে পারল না আশিক।

'কেন, বিশ্বশান্তি চেয়েছিলেন না? এবার আসবে জন্তুজানোয়ারের দল। এই তো এখনই আসবে, দেখুন শুধু। সত্যিকার স্বাভাবিকতায় শান্তিতে ভরে উঠবে বিশ্ব। মানুষের কৃত্রিমতা আর থাকবে না।'

দেখতে দেখতে রাস্তাঘাটে ঘাস গজিয়ে গেল। জঙ্গল হয়ে যাচ্ছে চারপাশে। একটা চিতাবাঘ দেখা গেল মাথা দুলিয়ে এগিয়ে আসছে। ওটার সামনে দিয়ে লাফিয়ে পার হলো একটা খরগোস। চিত্রা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে তৃণভূমিতে। দূর থেকে হুঙ্কার ছাড়ল একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

'ভাল করেই জানেন এটা আমি চাইনি! তামাশা করছেন আমার সঙ্গে?'

'দেখুন, তামাশা করা আমার পেশা নয়। ঠিক কি চেয়েছিলেন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা উচিত ছিল। আমার কাজ আমি করেছি, পৃথিবীর কোথাও এখন কোন হানাহানি, যুদ্ধ, কাটাকাটি, হিংসা-দ্বেষ কিছুই নেই। এটাই কি বিশ্বশান্তি নয়?'

'কিন্তু মানুষ ছাড়া পৃথিবীর কি দাম?'

'এই যে, এখানেই তো ভুলটা করেছেন। বলে দেননি যে মানুষ থাকতে হবে। শুধু বিশ্বশান্তি চেয়েছেন! পেয়েছেন!'

'ওসব কথার মারপ্যাঁচ বুঝি না! মানুষ যদি না থাকে, শান্তির কি দাম?'

রেগে গেল ইরাম, লাল হয়ে উঠল ওর ফর্সা চেহারা, 'ও, আপনি চেয়েছিলেন পৃথিবীর ছয় বিলিয়ন মানুষকে আমি ভাল করে দিই, না? যা কিনা গড, বুদ্ধ, আল্লাহ্, ভগবান কারও পক্ষেই আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। নিজেকে সর্বশক্তিমান হিসেবে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুব গর্ব বোধ করতেন, না?'

'আপনার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি শুধু চেয়েছিলাম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া সবখান থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ দুঃখ-

কষ্ট সব মুছে যাক। তা বলে মানব ইতিহাস মুছে ফেলতে আমি চাইনি।'

'খুঁটিনাটি সবকিছু উল্লেখ করা উচিত ছিল। আপনার প্রথম ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।'

'না, পূরণ হয়নি, নষ্ট হয়েছে।'

'দেখুন, তর্ক করবেন না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল ইরাম, 'দ্বিতীয় ইচ্ছা কি, সেটা বলুন। আমাকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দিন।'

'আগের পৃথিবীতে ফেরত যেতে চাই আমি, ঠিক যেখানে ছিলাম! মানুষজন সবার মধ্যে!'

'ঠিক তো?'

'ঠিক!'

ইরামের চোখের নিচের বিন্দুটা জ্বলে উঠল।

মিলিয়ে গেল জঙ্গল। জন্তুজানোয়ার উধাও হয়ে গেল। এক পথচারী হুমড়ি খেয়ে আশিকের গায়ের উপর উঠে পড়ল-প্রায়, ধমকে উঠল, 'চোখের মাথা খাইছেন নাকি? রাস্তার মাঝখানে খাড়ায়া রইছেন ক্যা?'

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল আশিক। চলতে শুরু করেছে রিকশা-গাড়ি। ফুটপাথে গিজগিজ করছে লোকজন। ফেরিওয়ালার চীৎকার, যানবাহনের শব্দ, হর্নের বিটকেল আওয়াজ, মাইকের কান ফাটানো হিন্দী গান—ভীষণ ভাল লাগছে সবকিছুই। চোখ ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখল কিছুক্ষণ আশিক।

অফিসে এসে দেখল ইরাম দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, মনোযোগ দিয়ে নখ খুঁটছে। আশিককে দেখে মুখ তুলে তাকাল, 'শেষ ইচ্ছেটা কি, ঠিক করেছেন?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপাস করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল আশিক। দু'হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে বলল, 'সময় দরকার, একটু চিন্তা করতে দিন।'

দরজায় শব্দ হলো, রুমা। ইরামের দিকে তাকাল না, আশিকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'আপনার সেক্রেটারি আজ কোথায়?'

'দেশের বাড়ি গেছে, তিনদিনের ছুটি নিয়েছে। মায়ের অসুখ।'

'ও। বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম দেখা করে যাই। সবকিছু ঠিকঠাক তো?'

'সব ঠিকই আছে,' বলল আশিক। 'আচ্ছা, কিছুক্ষণ আগে···কোন পরিবর্তন টের পেয়েছিলেন কি?'

'পরিবর্তন? কি পরিবর্তন?'

'মানে···' আমতা আমতা করল আশিক, 'এই ধরুন কিছুক্ষণের জন্যে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন, এরকম মনে হয়েছিল?'

'কি যে বলেন, কিছুর মাথামুণ্ড নেই।' গম্ভীর মুখে ইরামের দিকে তাকাল রুমা, 'আশিক সাহেবের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন?'

কোন কথা বলল না ইরাম, হাসিমুখে একইভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করল রুমা, আশিকের দিকে এগিয়ে এল দু'পা। 'বলছিলাম কি···' আর পারল না, অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ইরামের দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'প্লিজ, আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান!' বলতে বলতেই দারুণ চমকে উঠল! কোথায় গেল মেয়েটা! যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে সে নেই! ছোট্ট অফিসরুমের কোথাও ইরাম নেই! যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে!

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে রইল রুমা, তারপর বিড়বিড় করে উঠল, 'নিশ্চয়ই হিপনোটিজ্‌ম্ জানে! এর কিছু একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে!'

'আপনাকে তো বলেছি, নিজের চোখেই সবকিছু দেখছেন,' আস্তে করে বলল আশিক। 'অদৃশ্য দেহটা নিজের হাতে স্পর্শ করেছিলেন, করেননি?'

লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলল রুমা, 'আচ্ছা, না হয় ধরে নিলাম এসব কিছু সত্যি। মেয়েটা একটা "জিনী"। মানুষের ইচ্ছাপূরণ করে। কিন্তু, একটা ব্যাপার চিন্তা করছেন না কেন, মেয়েটা অশুভ! সবার জন্যে দুর্ভাগ্য বয়ে আনে সে। বুঝতে পারছেন না কেন, ভীষণ বিপদের মধ্যে আছেন আপনি।'

'আমার জন্যে খুব মায়া হচ্ছে?' দুষ্টুমির হাসি আশিকের ঠোঁটের

কোণে।

লজ্জা পেয়ে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিল রুমা, আস্তে করে বলল, 'তা তো হচ্ছেই!'

'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি সূত্রটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। নিজের জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে কিছু চাইতে হবে। পৃথিবীর বুকে সবাই যেন সুখে থাকে, সবার পেটে যাতে ভাত থাকে, বিনা চিকিৎসায় কেউ যেন না মরে, মুক্তস্বাধীন জীবন যাতে সবাই উপভোগ করে, অন্যায়-অবিচার-যুদ্ধ-হিংসা মুছে যাবে পৃথিবী থেকে... কিছু কি বাদ পড়ল? কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না, খুঁটিনাটি সব বলে দিতে হবে যাতে ফাঁকি না দিতে পারে।' বলতে বলতে টেবিলের উপর রাখা কমপিউটারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আশিক। ঝড়ের বেগে টাইপ করতে লাগল লম্বা লিস্ট, যাতে কোন কিছু বাদ না পড়ে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখল রুমা, মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল মনিটরের স্ক্রিন।

'কি, কিছু বাদ পড়েনি তো?' টাইপ করতে করতে চোখ তুলে চাইল আশিক, 'আটঘাট বেঁধে রাখতে হবে যাতে কোন ফাঁক না থাকে।'

কোন উত্তর দিল না রুমা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী-বোর্ডের খটাখট শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আশিকের সব মনোযোগ সেদিকে।

হঠাৎ কথা বলে উঠল রুমা, 'আচ্ছা, একটা কথা চিন্তা করছেন না কেন? সুখে-দুঃখে মিলে গড়া এই পৃথিবীতে আমরা এভাবেই বেঁচে থাকব, এটাই আমাদের নিয়তি। সর্বশক্তিমান বলে একজন যিনি আছেন, তিনি হয়তো সেটাই চান। আমাদের কি অধিকার আছে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবার? আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মের জন্যে দায়ী। সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য।'

কোন উত্তর দিল না আশিক। কী-বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে চেয়ে রইল মনিটরের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল রুমা, আশিক নড়ল না।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে ঢাকার বুকে। জানালার একখণ্ড ধোঁয়াটে আকাশে গোধূলির অস্পষ্ট লালিমা। রাস্তায় তেমনি ব্যস্ত জীবন।

দিনের শেষে ঘরে ফেরার তাগিদে ছুটছে সবাই, ঘরে অপেক্ষা করে আছে ওদের ছেলেমেয়ে-স্ত্রী-স্বামী-বাবা-মা-ভাইবোন। ধীরে ধীরে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে রাস্তায়। শেষ হয়ে গেল আরও একটা দিন।

'কি হলো? ভেবে দেখলেন, শেষ ইচ্ছেটা?'

চমকে পিছু ফিরল আশিক। আবছা আঁধারে বসে আছে ইরাম চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে।

হাত বাড়িয়ে কমপিউটারটা অফ করে দিল আশিক। মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তৈরি।'

ছয়

অনেক রাতে রুমার বাসায় ফোন বেজে উঠল। নিজের অজান্তেই ফোনের রিঙের অপেক্ষায় ছিল সে, ঘুমের লেশমাত্রও নেই দু'চোখে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ফোন ধরল, 'হ্যালো!'

'ঘুম ভাঙালাম?' হাসছে আশিক।

'না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রুমা, 'সব খবর ভাল?'

'হ্যাঁ। ভীষণ ভাল!'

'তৃতীয় ইচ্ছেটা? তার কি ঠিক করলেন?'

'সেটাও পূরণ হয়ে গেছে!'

অবাক হলো রুমা। 'বলেন কি? আমি তো একটু আগেও সি.এন.এন-এ দেখছিলাম তেলআবিবের রাজপথে বোমা বিস্ফোরণে এগারোজন মারা গেছে!'

'না, বিশ্বশান্তি আমি চাইনি। অন্য কিছু চেয়েছিলাম। একজনের মুক্তি চেয়েছিলাম।'

'সে আবার কি? কার মুক্তি? কিসের মুক্তি?'

'থাক্ না একটু রহস্য,' ম্লান হাসল আশিক। 'তবে সূত্রটা ঠিক রেখেছিলাম, নিজের জন্যে কিছু চাইনি।'

'যাই হোক্, আপনি খুশি তো?'

'হ্যাঁ, দারুণ ভাল লাগছে।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'যাক্, যে কারণে ফোন করা, কাল সন্ধেয় কি করছেন? আমার সঙ্গে ডিনার করুন না! আটটার দিকে স্কাইরুমে চলে আসুন।'

'ঠিক আছে। কাল সন্ধে আটটা, স্কাইরুম।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রুমা। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল, ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি।

ছোট্ট একটা পাহাড়ী শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। পাহাড়ের গায়ে চমৎকার সব বাড়ি। সবুজ গাছগাছালি ছায়া দিচ্ছে সর্বক্ষণ। নাম না জানা পাখীর কাকলি আর ফুলের হালকা সুবাস মাখা বাতাস। দু'একজন পথচারী দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, চলার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন তাড়াহুড়ো নেই। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি সবখানে।

পাইনবন ঘেরা ছোট একটা সাদা রঙ করা কাঠের বাড়ি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। সামনে ছোট্ট ফুলের বাগান। লতানো গোলাপ গাছ উঠে গেছে গাড়ি-বারান্দার ছাদে। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। সাদা রেলিংঘেরা খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে আছে ইরাম। উৎসুক চোখে উপভোগ করছে চারদিকের সৌন্দর্য। হাতে পাতলা কাঁচের সাদা ধপধপে চায়ের কাপ। ধোঁয়া উঠছে। ওর ডান চোখের নিচের রুপোলী বিন্দুটা কিন্তু আর নেই!

***

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভলিউম ও রিপ্রিন্ট বাদে সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষ বর্ধিত কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।